আমার স্কুল • আমার দুনিয়া • খুদে প্রতিভা • আমার রাজ্য

৫ মার্চ ২০১৬

আনন্দমেলা

১২টি রহস্য যার সমাধান হয়নি

যুক্তি-তক্কো দিয়ে যা মাপা যায় না, এমন এক ডজন রোমাঞ্চকর ঘটনা

আমার প্রিয়

প্রিয় মানুষ, শিক্ষক, বই, ছবি, গান, খেলা, নাটক, বেড়ানোর জায়গা, খাবার, গৃহপালিত পশু, জামা, মাছ নিয়ে পাঠকদের পাঠানো সেরা লেখাগুলো প্রকাশিত হল

খেলাধুলো

কামিন্দুর কৌশল

ব্রেন্ডন ম্যাকালামের

আনন্দমেলা

৪১ বর্ষ ২০ সংখ্যা ৫ মার্চ ২০১৬ ২১ ফাল্গুন ১৪২২

সূচিপত্র

প্রচ্ছদকাহিনি

গল্প

খেলাধুলো

আনন্দমেলা এবার ওয়েবসাইটে: **www.anandamela.in**

কমিক্স

নিয়মিত বিভাগ

প্রচ্ছদ: প্রত্যয়ভাস্বর জানা

সম্পাদক: পৌলোমী সেনগুপ্ত

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড ২১১/২০৭ উপেন ব্যানার্জি রোড কলকাতা ৭০০ ০৬০ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: আন্দামান, মণিপুর এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

খুদে প্রতিভা

বিকেলে বাড়ি ফেরার সময় দরজায় বেল টিপলে। যে দরজা খুলল, তাকে দেখে চমকে উঠলে তুমি। কে? লেখা প্রতিযোগিতার ফলাফল।

প্রথম

বিকেলে খেলা করে এসে দরজার বেলটা টিপলাম। শব্দ হল, 'অন্তর মম বিকশিত করো' কবিতাটি। আমি তো অবাক। এটা তো আমাদের ডোরবেলের শব্দ নয়। ক্যাঁচ করে দরজা খুললেন একজন। তাঁকে এক দেখাতেই চিনতে পেরে আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। গায়ে শাল, পাঞ্জাবি, ধুতি ও মুখে একগোছা লম্বা দাড়ি। ইনি তো বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ কী করে সম্ভব? তিনি আমায় অভয় দিয়ে বললেন, "ভয় পেও না। ঘরে তাড়াতাড়ি এসো, কথা আছে।" আমি কোনও কিছু ভাবার আগেই ঘরে ঢুকে পড়লাম। কেমন বিস্ময়ের সঙ্গে আনন্দের অনুভূতিও হচ্ছিল। তিনি বললেন, "সৌম্য, আনন্দমেলায় তোমার আগের লেখাটি মনোনীত হয়নি বলে তুমি প্রায় লেখাই ছেড়ে দিয়েছিলে। তাই আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। তুমি থেমে থেকো না। এখনও অনেক পথ চলা বাকি। যখন কিছু লিখবে, তখন সেটাকে অনুভব করবে। খাতা-কলমের মাঝে কোনও বিলাসিতা চলে না। লিখে যাও মনপ্রাণ ভরে।" তারপর তিনি আমায় একটি 'গীতাঞ্জলি' দিলেন এবং আশ্বাস দিলেন আমার লেখা নিশ্চয়ই সফল হবে। তখন আমি তাঁকে বললাম, "আচ্ছা, আপনি কি জানেন, আপনার নোবেলটি কে চুরি করেছিল?" তিনি হেসে বললেন "হ্যাঁ।" তিনি বলতে যাবেন, এমন সময় শুনতে পেলাম মায়ের গলা, "ওঠ-ওঠ বাবু।"

সৌম্যদীপ প্রামাণিক

সপ্তম শ্রেণি, রানাঘাট সেন্ট মেরিজ় ইংলিশ স্কুল, নদিয়া।
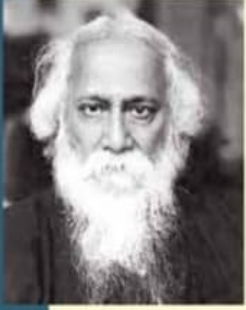
আমি কাল স্কুল থেকে একা-একা বাড়ি ফিরছিলাম। হঠাৎ একজন ভিক্ষুককে লাঠি নিয়ে রাস্তা পার হতে-হতে ভিক্ষে করতে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি আমার টিফিনের এবং যাতায়াতের বাঁচানো টাকা ভিক্ষুকের হাতে তুলে দিলাম। মনটা একটু হালকা হল। তারপর বাড়ি ফিরে ডোরবেলটা টিপতে না-টিপতেই দরজাটা খুলে গেল। বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই দেখি সোফায় একজন খাকি রঙের পোশাকপরা মানুষ, মাথায় টুপি। মানুষটিকে ভাল করে দেখার আগেই কারেন্ট চলে যাওয়ায় আলো সব নিভে গেল। তিনি হঠাৎ বলতে শুরু করলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ভিক্ষুক বা বুড়োমানুষ দেখলে পাশ কাটিয়ে চলে যাও, সাহায্য করার কোনও চেষ্টা করো না, তাদের দেখেই আমার কষ্ট লাগে। তোমাদের যেমন স্কুলের ম্যামরা বকলে খারাপ লাগে, তেমন বুড়োমানুষ বা ভিক্ষুকদেরও মনে কষ্ট হয় তাদের পাশ কাটিয়ে চলে এলে। কিন্তু তুমি ভিক্ষুকটিকে সাহায্য করায় আমি খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু আজ অনেক দেরি হয়ে গেল, চলি।" কারেন্ট এল। একটা চিরকুট পড়ে থাকতে দেখে খুলে দেখি একটি চিঠি ও শেষে লেখা 'ইতি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু'।

বহ্নিশিখা নন্দী

সপ্তম শ্রেণি, বার্লো বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মালদা।

আমি যখন খেলে বাড়ি ফিরছি, তখন বাড়ির ডোরবেল টিপলাম। খটখট হিলজুতোর শব্দ পেলাম। কিন্তু মা তো হিলজুতো পরেন না। তা হলে কে আসছে? দরজা খুলল আমার প্রিয় বন্ধু। বন্ধুর নাম মিনি মাউস। দরজাটা খুলতেই খুব সুন্দর গন্ধ পেলাম। কিন্তু কিসের? বিশ্বাস তো করতেই হবে। মিনি আর আমি ঘরে ঢুকে দেখলাম ডেইজ়ি নাচছে, ডোনাল্ড বাজাচ্ছে বাজনা। মিনি তখন ঝুমঝুমি নিয়ে বাজানো শুরু করে দিয়েছে। মিকি ও পিটার সাজাচ্ছে ঘর। প্লুটো দৌড়চ্ছে একটা লাল বলের পিছনে। আমিও লেগে গেলাম কাজে। কিন্তু গন্ধটা কিসের? আসলে গুফি বানাচ্ছিল রিচ চকোলেট কেক। দেখেই জিভে জল চলে এল। তারপর যখন ঘর সাজানো শেষ হল আমি আমার জামা ছেড়ে একখানা ভাল জামা পরে নাচতে লাগলাম। মিনি ও মিকি আর সবাই আমার ভাল বন্ধু হয়ে থেকো সারাজীবন।

অদ্রিজা নন্দী

চতুর্থ শ্রেণি, মেরি ইমাকুলেট স্কুল, মুর্শিদাবাদ।

বিকেলে মাঠে খেলতে গিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে এসে আস্তে ডোরবেলটা বাজালাম। আজ খুব দেরি হয়ে গিয়েছে। আবার বকা খাব না তো? দরজা খোলার শব্দ শুনে সামনে তাকিয়ে আমি আশ্চর্য হলাম। ওমা! এ কে? একবার ভাল করে চোখ কচলালাম। কিন্তু না, ঠিকই দেখছি। সামনে দাঁড়িয়ে আছে পুরো খাঁড়ার মতো উঁচু নাক নিয়ে আমার প্রিয় টেনিদা। আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বলল, "এই কিছুক্ষণ আগেই এলাম, বুঝলি? আয়, তোকে একটা গল্প বলব ভাবছি। প্যালা, হাবুল, ক্যাবলা আজকাল আমাকে পাত্তা দেয় না জানিস? ঠিক হ্যায়! কোই পরোয়া নেহি।" গল্প শুরু করল টেনিদা। আমিও জমিয়ে বসলাম। "একদিন আমি রাশিয়াতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম, বুঝলি? একটা বড় বাঘকে ধরতে হবে। ওটা নাকি মানুষখেকো হয়ে গিয়েছে। কেউ ধরতে পারছে না। তাই এই শর্মাকে তলব! জঙ্গল খোঁজা শুরু করলাম। নেই! আরও গভীর জঙ্গলে যেতে হল আমায়। সে কী ভীষণ ভয়ঙ্কর জঙ্গল, তুই ভাবতেও পারবি না।" হঠাৎ শুনতে পেলাম বাঘের গর্জন, স্বস্তিকা, স্বস্তিকা! "তারপর টেনিদা?" জিজ্ঞেস করলাম আমি। "এই আমি টেনিদা নই, তাড়াতাড়ি ওঠ," চোখ খুলে অবাক হয়ে দেখি, মা দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে। টেনিদা ভ্যানিশ!

স্বস্তিকা চৌধুরী
পঞ্চম শ্রেণি, এম পি বিড়লা স্কুল, কলকাতা।

সেদিন ছিল রবিবার। প্রত্যেক রবিবারের মতো সেদিন আমি ঠিকসময় বাড়ি পৌঁছতে পারলাম না। সর্বনাশ! ৪:৩০ বাজে। মা যদি জানতে পারেন খুব মারবেন। বাড়ির সদর দরজাটার সামনে আসতেই আমার গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল। ভয় পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে আমি বাড়ির ডোরবেলটা টিপলাম। যে দরজা খুলল, তাকে দেখে আমি চমকে পাঁচ পা পিছনে সরলাম। আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসছিল। আর-একটু হলেই আমি হার্টফেল করতাম। কারণ, আমি যাকে দেখেছি সে কোনও মানুষ নয়, একটা রক্তমাখা কঙ্কাল। তাও আমি মনকে শক্ত করে যেই ভেবেছি পিছনে ছুট দেব, অমনি আমার কাঁধে একজন হাত রাখল। পিছনে তাকাতে ভয় করছিল তাও তাকালাম। এ কী! এ তো ছোড়দা। ছোড়দা আবার কখন এল! আমি বোকার মতো ছোড়দার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকালাম। তখন ছোড়দা বলল, "দুর বোকা আমরা তোর সঙ্গে একটু মজা করছিলাম।" আমি তখন বললাম, "ছোড়দা তুমি কখনও আমার সঙ্গে এরকম মজা করবে না।" তখন ছোড়দা বলল, "ঠিক আছে। নে, এবার ঘরে চল। কাকিমা গরম-গরম লুচি আর আলুর দম করেছে। খাবি চল।"

সম্বিক কর্মকার
সপ্তম শ্রেণি, এন্ড্রুজ হাই স্কুল, কলকাতা।

আরও যারা ভাল লিখেছে

পূরন্বিতা পাল
তৃতীয় শ্রেণি, গুলুড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ শিশু শিক্ষা নিকেতন, পূর্ব মেদিনীপুর।

রোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বিতীয় শ্রেণি, মাজু মহিলা সমিতি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাওড়া

সোমঋক বন্দ্যোপাধ্যায়
সপ্তম শ্রেণি, সেন্ট জেভিয়ার্স হাই স্কুল, বাঁকুড়া।

অয়স্তিকা দে
অষ্টম শ্রেণি, বিনোদিনী গার্লস হাই স্কুল, হুগলি।

ঋষিতা বসু
তৃতীয় শ্রেণি, সরস্বতী শিশু মন্দির, পশ্চিম মেদিনীপুর।

সম্প্রীতি মণ্ডল
সপ্তম শ্রেণি, সতীশচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুল, নদিয়া।

অভিষিক্তা চক্রবর্তী
সপ্তম শ্রেণি, বোলপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

কথামৃত রায়
তৃতীয় শ্রেণি, দি লেভেনফিল্ড স্কুল, বীরভূম।

উষসী মিশ্র
অষ্টম শ্রেণি, রামকৃষ্ণ পল্লি বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ, দুর্গাপুর।

এবারের প্রতিযোগিতা

আচ্ছা, কী এমন খাবার আছে বলো তো, স্বাদেও ভাল, স্বাস্থ্যেও। যারা ক্লাস টু থেকে এইটে পড়ো, তারাই ১০০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠাও ২৮ মার্চের মধ্যে। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম ও ক্লাস জানিও বাংলা আর ইংরেজিতে। সেরা কয়েকটি লেখা আমরা ৫ এপ্রিল সংখ্যায় ছাপব। খামের উপর কোন সংখ্যার খুদে প্রতিভা পাঠাচ্ছ, লিখবে অবশ্যই। ঠিকানা: 'খুদে প্রতিভা', 'আনন্দমেলা', ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১

১২টি রহস্য যার সমাধান হয়নি

রহস্যের খনি ওরাং মেডান

পৃথিবীর বুকে অনেক সময়ই ঘটেছে এমন সব ঘটনা, থেকেছেন এমন সব মানুষ বা গড়ে উঠেছে এমন সব জায়গা, যুক্তি দিয়ে যার বিচার হয় না। তেমনই ১২টি উত্তর না পাওয়া প্রশ্ন নিয়ে লিখেছেন **সুদেষ্ণা ঘোষ**

যেখানে যুক্তির শেষ, সেখান থেকেই তো শুরু কল্পনার। সেখানের ঘটনাগুলো যে অবিশ্বাস্য হবে, এ তো আমাদের জানাই। কিন্তু ধুলোমাটির পৃথিবীতেই যে কখনও-কখনও ঘটে এমন সব ঘটনা, কল্পনার চেয়েও তারা ঢের রোমাঞ্চকর। প্রাচীন ইতিহাস থেকে নবীন সময়, সাক্ষী থাকে তাদের। তাদের কোনও-কোনওটা ঘটনার ঘনঘটায় হার মানিয়ে দেয় গল্প, রূপকথাকেও। যুক্তির শর্তগুলো মানা যায় না কিছুতেই। আমাদের মেনে নিতে হয় শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকের এক অমোঘ উক্তি, 'দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভ্‌ন অ্যান্ড আর্থ হোরেশিও, দ্যান আর ড্রেম্‌ট অফ ইন ইয়োর ফিলোজ়ফি'। মানে, স্বর্গে-মর্ত্যে অনেক ঘটনাই দর্শনের কল্পনার বাইরে। পৃথিবীর এক থেকে অন্য গোলার্ধে বিজ্ঞান বা মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে যেসব ঘটনার সামনে, তাদের কথায় ভরপুর এবারের প্রচ্ছদকাহিনি।

ইতিহাসের অমর মানুষ

১৭৬০ সালের একট ছোট্ট ঘটনা শোনা যাক। পটভূমি প্যারিস। কাউন্টেস ফন গ্রেগরি খবর পেলেন মাদাম দি পম্প্যাদুরের বাড়িতে এক বিরাট ভোজসভা বসবে। তাতে যোগ দেবেন কাউন্ট দে স্যাঁ-জর্মাঁ। কাউন্টেস তো খুবই উত্তেজিত বোধ করলেন। কারণ, ১৭১০ সালে

ভেনিসে থাকার সময় এই কাউন্টের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। উফ, কী দারুণ একজন গুণী মানুষ। কথাবার্তায় অতি রসিক। কী দারুণ পিয়ানো বাজান। এতদিন পরে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। ভাবাই যায় না। সাজগোজ শুরু করলেন কাউন্টেস। পার্টিতে এসে মাদাম গ্রেগরি কিন্তু যারপরনাই বিস্মিত। ওমা এ কে? প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও কাউন্টের বয়স তো এক। তা হলে কি তাঁর সঙ্গে স্যাঁ-জর্মাঁর বাবার আলাপ হয়েছিল?

ওপাশ থেকে মৃদু হাসি মেখে উত্তর এল, "মাদাম, আমিই স্যাঁ-জর্মাঁ। আপনার সঙ্গে আমারই পরিচয় হয়েছিল।" "ওহ, ক্ষমা করবেন," মুখে বললেন বটে, তবু মনে কিন্তু-কিন্তুটা গেল না। 'এ তো প্রায় অবিশ্বাস্য। পঞ্চাশ বছরেও চুলে এতটুকু পাক নেই। মুখে কোনও বলিরেখা নেই। আমি তো কেমন বুড়ি হয়ে গিয়েছি। কাউন্ট একদম একই রকম অর্ধেক শতাব্দী পেরিয়েও...' তাঁর মনের কথা বুঝেই আবার মুচকি হাসলেন কাউন্ট, "মাদাম, আমি কিন্তু সত্যিই বেশ বৃদ্ধ। আপনি দেখতে পারছেন না, এটাই যা..." "কিন্তু কত? তখন যদি আপনার বয়স পঁয়তাল্লিশ হয়, এখন তো প্রায় একশো।" কাউন্টেসের বিস্ময়ের শেষ নেই। তা হলে...

কাউন্টেসের এই অভিজ্ঞতা কিন্তু অনেকেরই হয়েছে। ইউরোপীয় ইতিহাসের বহু স্বনামধন্য মানুষ, মাদাম দে প্যাম্পাদুর, ভোলত্যের, রাজা পঞ্চদশ লুই, ক্যাথারিন দ্য গ্রেট, অ্যান্টন মেসমার, জর্জ ওয়াশিংটন কাউন্ট স্যাঁ-জর্মাঁকে চিনতেন। ইতিহাস এমনটাই দাবি করছে। জনশ্রুতি বলে, যিশু খ্রিস্টের সঙ্গেও নাকি তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হয়। এটা একটু বাড়াবাড়ি। তা যদি সত্যি নাও হয়, ইতিহাসের বিভিন্ন সময় এর আবির্ভাব ঘটেছে। তার লিখিত প্রমাণ আছে। আর চিরকালই তার বয়স থেকেছে এক জায়গায়, ৪৫ বছর। 'হ য ব র ল'-র উদোর কথা মনে পড়ছে নাকি? মানুষটি কিন্তু বেশ রহস্যময়। পারলৌকিক বিদ্যার চর্চাটর্চা করতেন। নানা গোপন ষড়যন্ত্রের ঘটনায় কাউন্টের নাম জড়ানো হয়। অন্য দিকে আবার এঁর গুণের শেষ নেই। অ্যানি বেসান্তের লেখা 'দ্য কোঁত দ স্যাঁ-জর্মাঁ' গ্রন্থ বলে, ১৬৯০ সালে ট্রানসিলভানিয়ার যুবরাজ ফ্রান্সিস দ্বিতীয় রাকোকজ়ির পুত্র স্যাঁ-জর্মাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন সেকালের প্রথিতযশা অ্যালকেমিস্টদের একজন।
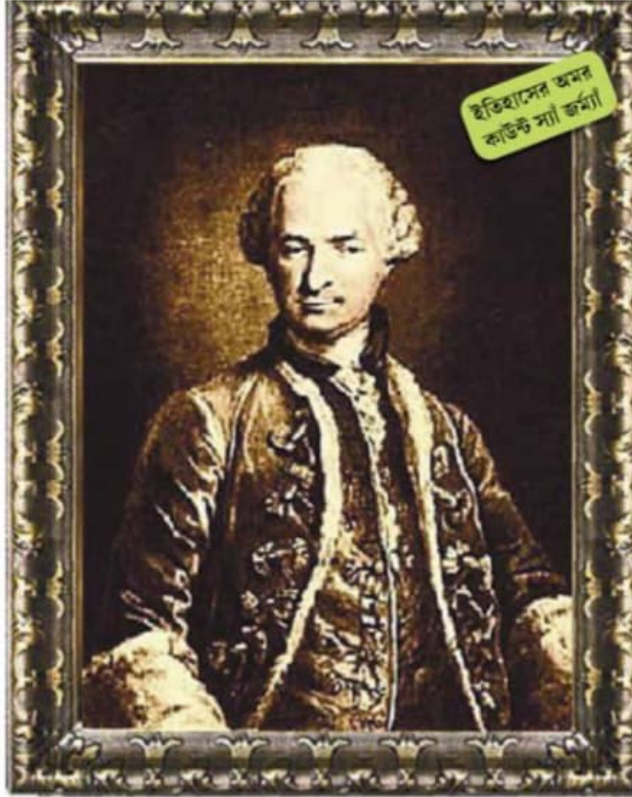
সেকালে এরকম কিছু মানুষের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। গবেষণাগারে নাকি স্তূপাকৃত ধাতুকে সোনায় পরিণত করতেন অ্যালকেমিস্টরা। গবেষণাগারে পরীক্ষা করতে-করতেই কি কাউন্ট আবিষ্কার করেছিলেন অমর হওয়ার ওষুধ? কে জানে! তা প্রমাণ করার দায় ইতিহাস রাখেনি। যেটুকু ইতিহাস মনে রেখেছে, তা হল ১৭৪০ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে ইউরোপের নানা জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়ান। যাঁদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, প্রত্যেকেই মানুষটির সঙ্গে আলাপে চমকে উঠত। মনে রেখেও দিত সারাজীবন ঠিক কাউন্টেস ফন গ্রেগরির মতোই। লোকটার গুণের শেষ নেই। প্রগাঢ় জ্ঞানী। বারোটা ভাষা জানতেন (তার মধ্যে গ্রিক, ল্যাটিন থেকে জার্মানি, ফরাসি, রুশ, সংস্কৃতও ছিল)। অসাধারণ বেহালা বাজাতেন। দারুণ ছবি আঁকতেন। এমন মানুষ তো এক অর্থে বিরল! পয়সাকড়িও বেশ ভালই ছিল মনে হয়। বন্ধুদের নিয়ে বড়-বড় ভোজসভার আয়োজন করতেন। পারসিয়া রাজসভায় পাঁচ বছর কাটিয়ে তিনি অলঙ্কারবিদ্যায় প্রবল দক্ষতা অর্জন করেন। ভোজবাজির মতো অনেক ছোট-ছোট হিরে বা মুক্তোকে একটা বড় হিরে বা মুক্তোয় পরিণত করতে পারতেন। তাঁর জামা থেকে জুতোয় ঝলমল করত মূল্যবান ধনরত্ন। সব অবশ্য গবেষণাগারে তৈরি কিনা জানা নেই। এসবের সঙ্গে মুখের বলিরেখা দূর করার ও চুল কালো করার ওষুধও তিনি নিশ্চয়ই জানতেন। না হলে কী করে বয়সকে আটকে রাখবেন হাতের মুঠোয়? জানা যায়, মধ্যযুগের গুপ্তসমাজ, সোসাইটি অফ এশিয়াটিক ব্রাদার্স, দ্য নাইটস অফ লাইট, দি ইলুমিনাটি ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাঁর। নথিতে ১৭৮৪ সালে তাঁর মারা যাওয়ার একটা খবর পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু তা হলে ১৭৮৫ সালেই বিখ্যাত হিপনোটিস্ট অ্যান্টন মেসমারের সঙ্গে তাঁর দেখা হল কী করে? মেসমারকে হিপনোটিজ়মের বিদ্যেটি তিনিই দেন। আবার ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের সময় তাঁর কথা পাওয়া যাচ্ছে। ফরাসি রানি মেরি আঁতোয়ানেতের মারা যাওয়ার সময়, ডিউক দে বেরির মারা যাওয়ার আগের দিন তাঁর সঙ্গে এক মহিলার দেখা হয়েছিল। ১৮২১ সালে সেই ভদ্রমহিলা কোঁতেস দাদেমার লিখেছেন, ১৮২০ সাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ইতিহাসের বিখ্যাত অমর মানুষটির বিভিন্ন সময় দেখা হয়েছে। তবে সব সময়েই তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠায়ই আটকে ছিল। মাদাম ফন গ্রেগরির মতোই তিনিও এই চিরপ্রৌঢ় কাউন্টকে দেখে খুবই বিচলিত হয়েছেন। তবে স্যাঁ জর্মাঁর অস্তিত্বের সবচেয়ে মূল্যবান প্রমাণটি দিয়ে গিয়েছেন বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ভোলত্যের। 'মানুষটির কোনও মৃত্যু নেই আর সমস্ত জ্ঞান তাঁর

হাতের মুঠোয়।' যুক্তির আদালতে কি এর পর আর তাঁকে তোলা যায়? কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যায়, বয়স থামানোর আর অমরত্বের টোটকাটি তিনি পেলেন কী করে? সৃষ্টির গোড়ার নিয়মকে উলটে দেওয়া কি চাট্টিখানি কথা? এত লিখিত প্রমাণ আর প্রশংসা সত্ত্বেও মধ্যযুগের কাউন্ট অবিশ্বাস আর বিশ্বাসের মাঝের জায়গাটুকুতেই থেকে যান।

দুর্বোধ্য পাণ্ডুলিপি

মধ্যযুগীয় ইতিহাসের এক সেরা রহস্যময় নিদর্শন ভয়নিখ পাণ্ডুলিপি। ভাষা তো অচেনা বটেই। তেমনি অক্ষরগুলোর আদল এমন অপরিচিত যে একশো বছর ধরে বাঘা-বাঘা লিপিবিদরা চেষ্টা চালিয়েও কিছু সুবিধে করতে পারেননি। বইটির মধ্যে কিছু রঙিন গাছের ছবি আছে, যেগুলো আধুনিক উদ্ভিদবিদদের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা। কিছু জ্যোতির্বিদ্যার তথ্যও রয়েছে। কেউ মনে করেন, প্রাচীন অ্যালকেমিস্টরা তাদের সংকেত আবিষ্কারগুলো গোপন রাখার জন্যই ওই রকম অচেনা সাংকেতিক ভাষার সাহায্য নিয়েছিলেন। কিন্তু যদ্দিন না ওর পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে, কেউ কোনও কিছু জোর দিয়ে বলতেও পারছে না। ভিনগ্রহী থেকে ভূত, জল্পনার মধ্যে এসে যায় আরও অনেকেই। ভাষাটার কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল, কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিটা কার ছিল, সে সম্বন্ধেও অন্তহীন কুয়াশা। কত যে হাত ঘুরেছে, তার ইয়ত্তা নেই। প্রথমটা ইতিহাস এর পরিচয় জানে জার্মানির রাজা দ্বিতীয় রুডল্ফের সময় থেকে। ৬০০ সোনার ডুকাট বা মুদ্রা দিয়ে ব্রিটিশ জ্যোতিষী জন ডির (১৫২৭-১৬০৮) কাছে রুডল্ফ পুঁথিটি পান। তাঁর কাছে এই পুঁথিটির সঙ্গে বিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক রজার বেকনের অন্য পাণ্ডুলিপিগুলোও ছিল। রুডল্ফ ভেবেছিলেন এটিও হয়তো রজার বেকনের ডায়েরি। এই বই সম্বন্ধে ডি-র ছেলে এক জায়গায় বলেছেন, "বাবার কাছে একটা হায়রোগ্লিফিকসের বই আছে বটে। তবে আমার সন্দেহ আছে উনি ওটা একটুও বুঝতেন কিনা!" রাজা রুডল্ফ বইটি জাকোবাস হরকিকি ডি টেপেনজ় নামে একজনকে দেন। হাত ঘুরে ১৬৬৬ সালে ক্রোনল্যান্ডের আথানাসিয়াস কারশার নামে একজন এই দুর্বোধ্য বইটি উপহার পান। ইতিহাস অন্তত এই সন্ধানই দিচ্ছে। এর পর ফাঁকা থেকে যায় অনেক শতক। হালে ১৯১২ সালে উইলফ্রেড এম ভয়নিখ রোমের কাছে ফ্রাস্কাতি জেসুইট কলেজ থেকে অদ্ভুত বইখানির খোঁজ পান। কালবিলম্ব না করে বইটি নিজের সংগ্রহে নিয়ে আসেন। এটি প্রচারের আলোয় আসে। পৃথিবী জুড়ে হইচই শুরু হয়। তৎকালীন মালিকের নামের সঙ্গে বইয়ের নামও জড়িয়ে যায়।

ভয়নিখ পাণ্ডুলিপি

ভয়নিখ পাণ্ডুলিপির সঙ্গেই বিস্ময়ে পাল্লা দিতে পারে আরও একটি বই। তার নামটি আমাদের খুব চেনা। পৃথিবীর এক সেরা মহাকাব্য। হোমারের লেখা ওডিসি। ১৫০৪ সালের বইটির ভেনেশীয় সংস্করণ আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পৌঁছয় ২০০৭ সালে। বইটি অদ্ভুত নয়। কিন্তু এর মার্জিনে প্রচুর অদ্ভুত ভাষায় লেখা বিচিত্র সব নোট, অ্যানোটেশন। বোঝাই যায় খুব মন দিয়ে কেউ বইটি পড়েছে আর সাইডনোট লিখেছে। কিন্তু কে? তার ভাষাই বা কী? জানার খোঁজে লেগে পড়ে সবাই। কিন্তু আধুনিক তো ছাড়, সেই ভাষাটির সঙ্গে এই প্রাচীন পৃথিবীর কোনও ভাষারই মিল নেই। প্রায় সব দেশেরই ভাষাবিদরা এসে বইটি একবার করে উলটেপালটে দেখেছেন। চোখে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে অনেক ঘণ্টা, রাতের পর-রাত কাটিয়েছেন। সমাধানে আসা যায়নি। কোনদিন ভাষাটা আবিষ্কার হলে খুলে যাবে অতীতের অনেক বন্ধ দরজা।

মৃত্যুজাহাজ ওরাং মেডান

১৯৪৭ সালের জুন মাস। ইন্দোনেশিয়ার কাছে সমুদ্রের মধ্যে সিলভার স্টার আর সিটি অফ বাল্টিমোর নামে দুটো জাহাজের রেডিয়োরুমে মর্সকোডে এক এস ও এস মেসেজ এসে পৌঁছল। কর্তব্যরত অফিসারদের তো চোখ কপালে উঠল। এ কী ভয়ানক মেসেজ! 'ক্যাপ্টেনসুদ্ধ প্রত্যেক অফিসারের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে চার্টরুম আর ব্রিজে। সম্ভবত প্রত্যেক ক্রু মেম্বারই মৃত।' তারপরের মর্সকোড কেমন অস্পষ্ট। ঠিক পড়া গেল না। তারপরেরটুকু আরও ভয়ানক। 'আমিও মারা যাচ্ছি।' এর পর রইল শুধু অন্তহীন নৈঃশব্দ্য। মালয়েশিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে যে মালাক্কা খাঁড়ি, সেখানেই ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল জাহাজটি। ঠিক যেন কোথাও যাওয়ার নেই। ঢেউয়ের দোলায় মৃদু দুলছে। একটু যেন জিরিয়ে নিচ্ছে। কাছাকাছি একটি লাইসেন্সিং পোস্টের কর্মীরা দূরবিন দিয়ে দেখে এইসবই ভাবছিলেন। আরে এটা তো একটা ডাচ মালবাহী জাহাজ মনে হচ্ছে। দূরবিনের নিয়ন্ত্রক ঘুরিয়ে নামটাও এবার স্পষ্ট হল। এস এস ওরাং মেডান। বিপদ হল নাকি! মর্সকোড পাঠিয়েও কোনও সাড়া এল না। যাক, পাশ দিয়ে আর-একটা জাহাজ যাচ্ছে। নামটা পড়াও গেল, সিলভার স্টার। ওরা যদি গিয়ে একটু দেখে। চিন্তান্বিত পোস্ট অফিসাররা দেখতে পেলেন, বাণিজ্যতরী সিলভার স্টারের সঙ্গে তাদের চিন্তা মিলে গেল। দূরবিনে দেখা গেল সিলভার স্টার থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল দুটো জাহাজ। তারপর লাফ দিয়ে পাশের জাহাজের ডেকে নামল উদ্ধারকারী দল।

ওখানে কী দেখল তারা? নামার পরেই তো তিনহাত পিছিয়ে আসতে হল। জলদস্যু! সমুদ্রদানব! না, তার চেয়েও ভয়ানক। গোটা ডেক জুড়ে মৃতদেহের স্তূপ। চোখগুলো খোলা। মুখেচোখে তীব্র আতঙ্কের ছবি এখনও যেন বোঝাচ্ছে কী ভয়ানক শত্রুরই না মোকাবিলা করতে হয়েছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। আততায়ী কি এখনও আছে নাকি জাহাজে লুকিয়ে! মুখে রুমাল চেপে হাতে অস্ত্র বাগিয়ে নীচের কেবিনের দিকে পা বাড়াল ওরা, "কেউ কি জীবিত আছ?" চিৎকারগুলো ফিরে এল ফাঁকা শুনশান করিডর দিয়ে। দুপাশের কেবিনেও শুয়ে-বসে মানুষ। সব মৃত। চোখে পড়ল একটা বাহারি কাসকেট। আহা, কুকুরটাকেও ছাড়েনি অমোঘ মৃত্যুর বাণ। রেডিয়ো অপারেটরের ঘরে গিয়ে আবার চমক। আরে, উনি তো দাঁড়িয়ে! তা হলে কি জীবিত? উনিই তা হলে তার পাঠিয়েছেন। মর্স পাঠানোর চাবিটিই তো চেপে ধরে আছেন। কাছে গিয়ে কাঁধে আলতো চাপ দিতেই গড়িয়ে পড়লেন। এরও চোখ খোলা। ইনিও তা হলে... কী আশ্চর্য, এত মৃতদেহ। অথচ কারও শরীরে আঘাতের চিহ্ন নেই। কোনও ধস্তাধস্তির চিহ্নও নেই। সিলভার স্টারের উদ্ধারকারী দল নিজেরা আলোচনা করতে লাগলেন, বন্দরে গিয়ে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। আপাতত জাহাজের সঙ্গে দড়ি বেঁধে টেনে নেওয়া তো হোক। এমন সময়ই নীচের তলায় ৪ নম্বর কার্গো থেকে প্রবল ধোঁয়া আসতে শুরু করল। প্রাণের ভয়ে ওরা সবাই উর্ধ্বশ্বাসে কাঠের পাটাতন টপকে নিজের জাহাজে ফিরে হাঁফ পুরোটাও ছাড়েনি। সঙ্গে-সঙ্গেই ওরাং মেডানে বিস্ফোরণ হতে শুরু করল। দ্রুত হাতে ছুরি চালিয়ে সিলভার স্টারের লোকজন জাহাজের মাঝের দড়িটা কাটতে থাকল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওরাং মেডান সব রহস্য, ধন্দ বুকে নিয়ে সমুদ্রের অতল গহ্বরে ঠাঁই নিল। চিরতরে। অমনি গল্প বোনা শুরু হয়ে গেল। নির্জন অকূল সমুদ্রের ভূতপ্রেত, দৈত্যদানোর গল্প তো খুব প্রচলিত। কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও উঠে এল। সমুদ্রতল থেকে উঠে আসা বিষাক্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের কবলে পড়তে পারে দুর্ভাগা জাহাজটি। সেই কারণে রক্তপাত ছাড়াই প্রাণ হারাল সবাই। অন্য একটি মত বলল, জাহাজটির কার্গো বেআইনি সালফিউরিক অ্যাসিডে বোঝাই ছিল। কোনওক্রমে শিশি ভেঙে যাওয়ায় বিষাক্ত গ্যাস উঠে গ্রাস করে ফেলেছিল গোটা জাহাজটিকেই। বেআইনি হওয়ায় তার কোনও প্রমাণ নেই। এত কিছু সত্ত্বেও নিরালা সমুদ্রের হাওয়ায় অজানা শিরশিরানি ভেসে রইল কয়েক শতক। সবচেয়ে জোরালো সিদ্ধান্ত যে দিতে পারত, সেই জাহাজটাই তো জলের তলায় মুখ লুকিয়ে বসে রইল। তাই পৃথিবীর অমীমাংসিত ঘটনাদের ভিড়ে উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে রইল গত শতাব্দীর অভিশপ্ত জাহাজ এস এস ওরাং মেডান।

চিনদেশের বামন গ্রাম

আর-পাঁচটার মতোই চিনদেশের এক অখ্যাত গ্রাম ইয়াংসি। হাসিখুশি খুদে চোখের মানুষঘেরা সিচুয়ান প্রদেশের এক গ্রাম। এক অদ্ভুত কারণে গবেষকমহলে পেয়ে গিয়েছে অবিশ্বাস্য খ্যাতি। ওখানকার জনসংখ্যা মাত্র আশিজন। আর তাদের অর্ধেকই খুদে, মানে বামন। ভাবতে পার, এক গ্রামের এতজন বামন! বামনগ্রাম নামে ডাকলেই হয়। ঠাট্টা করার আগে জেনে নেওয়া যাক এদের পরিস্থিতি। শোনা যায় ষাট বছর আগে এক মারণব্যাধির বীজ উড়ে এসেছিল এখানে। ছোট্ট বাচ্চারা যাদের বয়স পাঁচ থেকে সাতের মধ্যে, তারাই এর প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বাড় বন্ধ হয়ে যায় তাদের। কিন্তু অভিজ্ঞতা আর গবেষণা বলে যে, ২০ হাজার মানুষের মধ্যে একজন দুর্ভাগারই এইরকম প্রাকৃতিক কারণে বাড়বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ইয়াংসি গ্রামের এতজন মানুষ একসঙ্গে কী করে বামন হলেন, সে নিয়ে বিজ্ঞানীরা ভুরু কুঁচকেই রয়েছেন। কোনও মীমাংসা হয়নি। ডাক্তারি পরীক্ষাতেও কিচ্ছু বেরয়নি। তাই এখনও এই গ্রামের ছোট-ছোট মানুষরা রহস্যের চাদর মুড়েই আছে। একটা সময় নাকি এখানে অনেক মানুষজন বাস করতেন। যেসব ছোট বাচ্চাদের মধ্যে প্রথম এই রোগ হল, তারা তো বেঁটে হয়ে গেল। পরে ওই শিশুরাই যখন বড় হল, তাদের সন্তান হল, বড় হয়ে তাদের উচ্চতাও হল কোনওক্রমে এক মিটার। অর্থাৎ তারাও বামন। এ রোগ তো বংশপরম্পরায় বইছে। ভয়ে অনেকেই এখান থেকে চলে যেতে থাকেন। বেঁটে-বেঁটে লোকদের দেখতে আশপাশের গ্রাম থেকে লোকে এখানে ভিড় করতে থাকে। চিনা সরকার তখন ব্যবস্থা নেন। ওই গ্রামে বাইরের লোকের যাওয়া নিষেধ করেন। কিছু মানুষের কষ্ট যাতে কখনই অন্যদের কৌতূহল আর হাসিঠাট্টার বিষয় না হয়, সেই মানবিক ভাবনা থেকেই। তবে তাতে অন্য গ্রামের লোকের কথা আটকানো যায় না। তারা বলাবলি করতেই থাকে, নিশ্চয়ই ওই গ্রামের বাতাসে কোনও দুষ্ট হাওয়া ঢুকে পড়েছে। ঠিকঠাক সৎকার না করার জন্য পিতৃপুরুষদের রাগ গ্রামের উপর অভিশাপ হয়ে নেমে এসেছে। গ্রামের কোনও অল্পবয়সি ছেলে নাকি একবার এক কালো রঙের কচ্ছপ শিকার করে পরিবারসুদ্ধ তার মাংস খেয়েছিল। তারপরেই নাকি গ্রামের বাতাসে অশুভ সংকেত দেখা দিতে শুরু করে। এইসবও বলতে থাকে গ্রামের বৃদ্ধ দাদুরা থেকে আড্ডাবাজরা। কচ্ছপ আসলে চিনাদের কাছে খুব শুভ তো।

চিনদেশের বামনরা

ইদানীং দেখা যাচ্ছে, ওই গ্রামের নতুন যে প্রজন্ম দিনের আলো দেখেছে, তাদের মধ্যে আর এই রোগের লক্ষণ নেই। আশা করা যায়, আর বেশিদিন ইয়াংসি গ্রামকে বামন হওয়ার কষ্ট নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে না। আর পাঁচটা গ্রামের মতোই সেখানেও সবাই সাধারণ মানুষের মতোই আড়ে-দিঘে বড় হয়ে উঠতে পারবে।

রহস্যের মুখোশপরা ডাকাত

আজও ইতিহাস ঘেঁটে আমেরিকার ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন যেসব রহস্যের সামনে মাথা নেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়, তারই একটি ড্যান কুপারের রহস্য।

বোয়িং ৭২৭ প্লেনটির যাত্রীরা প্লেনে ওঠার সময়ও জানতেন না, কী ভয়ানক সময়টাই না আসতে চলেছে তাঁদের জীবনে। সেটা ছিল ২৪ নভেম্বর, ১৯৭১। পোর্টল্যান্ড থেকে সিয়াটেল যাচ্ছিল প্লেনটি। বিকেল সবে হয়েছে। যাত্রীরা ওঠার পর এয়ারহোস্টেসরা খাবার দিয়েছেন। কেউ-কেউ এমনি হেলান দিয়ে সিটে বসে সাদা মেঘের কাণ্ড দেখছেন। কেউ নজরই করেনি, এককোণ থেকে বছরচল্লিশের এক মানুষ উঠে দাঁড়ালেন। পরনে ডার্ক রঙের সুট। টাইবাঁধা। দেখলে যেন বিজনেস এগজিকিউটিভ মনে হয়। কারও চোখে পড়ল না, তাঁর চাউনিটা কিন্তু ভীষণ ক্রূর। ঠিক যেন ধারালো ইস্পাতের ফলা। তিনি ধীর পদক্ষেপে বিমানের পিছন দিকে ক্রুদের কেবিনে হেঁটে গেলেন। এক ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টকে ডেকে খুলে দেখালেন তাঁর ব্রিফকেসটি। কিছুক্ষণের মধ্যেই যাত্রীরা মাইক্রোফোনের ঘোষণা শুনল, প্লেন হাইজ্যাক হয়েছে। হাইজ্যাকারের কাছে বোমা আছে। দু' মিলিয়ন ডলার আর দুটো প্যারাশুট দিলে তবেই নাকি যাত্রীদের মুক্তি দেবে ড্যান কুপার। না হলে ব্রিফকেসের মধ্যে রাখা বোমাটার সদগতি করবে। যাত্রীরা ইষ্টনাম জপতে শুরু করল পাইলটরা যোগাযোগ করল সিয়াটেল এয়ারপোর্টের সঙ্গে। সরকারের সঙ্গে ডাকাতের দরদস্তুর চলতে লাগল। প্লেনের ভিতর যাত্রীদের গায়ে আঁচড়ও কাটল না ড্যান কুপার। এক সময় সিয়াটেল-ট্যাকোমা এয়ারপোর্টে প্লেনটি নামানো হল। কুপারের হাতে টাকার ব্যাগ তুলে দেওয়া হল। সমস্ত প্যাসেঞ্জার আর কিছু ফ্লাইট ক্রুকে ড্যান কুপারের আদেশে নামিয়েও দেওয়া হল। কিন্তু নামতে পারলেন না তিন পাইলট আর এক কেবিন ক্রু। কারণ, তখনও তাদের দিকে তাক করে আছে কুপারের রিভলভারের ধাতব নল। "মেক্সিকোর দিকে ফ্লাইটের মুখ ঘোরাও।"

যাত্রীদের বর্ণনা শুনে আঁকা ড্যান কুপারের ছবি

নির্দেশ পেয়ে সেদিকেই উড়ে চলল বোয়িং ৭২৭। মিনিটপঁয়তাল্লিশ সময় কেটে গেল। এদিকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কেবিন ক্রুকে ধমকধামক দিয়ে ককপিটে পাঠিয়ে দিল কুপার। সামনের এয়ারস্টেয়ার খুলে ফেলল সে। ঘন কালো আকাশ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝোড়ো হাওয়া পাগলের মতো বইছে। বহু দূরে বিন্দুর মতো শহরের আলো জ্বলছে। প্যারাশুট নিয়ে ঝাঁপ দিল কুপার। পোর্টল্যান্ডের উত্তরে জায়গাটি হবে। বিস্ফারিত পাইলট কালবিলম্ব না করে ইঞ্জিন ঘুরিয়ে দিল সিয়াটেল বিমানবন্দরের দিকে।

এয়ারপোর্টে নামার পর পুলিশ দেখল দুটো প্যারাশুটের সঙ্গে শুধু কুপারের টাইটি পরে রয়েছে সিটে। এয়ারফোর্সের হেলিকপ্টাররা একটু দূর থেকে পণবন্দি প্লেনটিকে ফলো করছিল। তারা বুঝতে পারল না ঠিক কোথায় নামল কুপার। পাঁচ মাস ধরে মাটিতে, আকাশে আমেরিকার পুলিশবিভাগ হন্যে হয়ে গেল জনৈক ড্যান কুপারের তল্লাশিতে। লাভ হল না। এমনকী, এস আর-৭১, সুপারসিক্রেট গুপ্তচর প্লেন গোটা ফ্লাইটের পথটির ফোটো তুলেছিল। তাদের কাছেও ড্যান কুপারের কোনও হদিশ মিলল না।

ন' বছর পর। ১৯৮০ সাল। পোর্টল্যান্ডের উত্তরে টেনা বার। পাশ দিয়ে কলাম্বিয়া নদী বইছে। এক সুন্দর সকাল। ব্রায়ান ইনগ্রাম নামের বাচ্চা ছেলেটি বালির মধ্যে আপন মনে গর্ত খুঁড়ছিল। আরে, ধুলোবালি মেখে সেখান থেকে বেরিয়ে এল তিনবান্ডিল মার্কিন ডলার। তাদের গায়ে রাবার ব্যান্ড এখনও জড়ানো। গোয়েন্দা বিভাগে খবর পৌঁছল। তারা সদলবলে এল। প্রায় ৫,৮৮০ ডলার রয়েছে বান্ডিলগুলোয়। আরে, কুপার এখানেই তো কাছাকাছি কোথাও লাফ মেরেছিল! কুপারকে দেওয়া টাকার সঙ্গে সিরিয়াল নম্বরও মিলল। এটাও ঠিক যে কুপার লাফ দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তো টাকা মাটিতে পুঁতে যায়নি। নিশ্চয়ই পরে এসে বালির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। তা হলে তো কুপার মারা যায়নি। কী হল তার? এত খোঁজাখুঁজিতেও সে গায়েব হয়ে রইল কীভাবে? আর তার মারা যাওয়ার কথাও নয়। যেভাবে সে ঝোড়ো রাতে প্যারাশুট নিয়ে লাফ দিয়েছিল, তাতে সে যে ভাল ট্রেনিং নিয়েছে বোঝাই যায়। নতুন করে আর-এক প্রস্থ সার্চ অপারেশন শুরু হল। এফ বি আই নদী, বালি চুলচেরা তল্লাশি করেও বালির মধ্যে টাকার ব্যাপারে কোনও আলো দেখাতে পারলেন না। বরং উলটে এই ঘটনায় ড্যান কুপারের রহস্য আরও একটু ঘনীভূত হয়ে গেল। তাকে নিয়ে বই, কমিক্স, গান এমনকী, সিনেমাও তৈরি হল। ১৯৫৪ সালের বিখ্যাত কমিক্স স্ট্রিপ ড্যান কুপার (কানাডিয়ান এয়ারফোর্সের পাইলট) থেকেই সে নিজের ছদ্মনাম ধার করেছিল বলে গুজব রটল। রসিক তাকে বলা যায়! ড্যান কুপার কেমন যেন একটু রসিকতা করেই পুলিশকে ফাঁকি দিল।

২০০৭ সালে এফ বি আই ফাইল আবার খুলল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কুপার হয়তো মারাই গিয়েছিল। কিন্তু কোনও প্রামাণ্য তথ্য না পাওয়া যাওয়ায় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে কে ছিল এই ড্যান কুপার, সে সম্বন্ধে আজও বিন্দুমাত্র আভাস পাওয়া যায়নি। ১৯৭১ সাল থেকে এই রহস্যময় স্কাইজ্যাকিং কেস অমীমাংসিত হয়েই পড়ে রয়েছে।

কোথায় গেল ফ্লাইট ৩৭০

মালয়েশিয়ার কুয়ালা লামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৮ মার্চ, ২০১৪ সালে উড়ান দিল ফ্লাইট ৩৭০। রাতের বেলা।

সবাই খাওয়াদাওয়া করে নিশ্চিন্ত ঘুমের গভীরে তলিয়ে গেল। মেঘেদের পাশ কাটিয়ে উড়ে চলল মালয়েশিয়ার বোয়িং ৭৭৭ এয়ারলাইন্সের জেটফ্লাইট। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগও ছিল। এক ঘণ্টা পরেও দক্ষিণ চিনাসাগরের উপরের দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় কন্ট্রোল অফিসে ওদের সিগন্যাল পৌঁছেছিল। রাত ১:১৯ তখন। ভাবা যায়নি ওটাই ছিল তার শেষ সংকেত। ১:২২ থেকেই এয়ারট্রাফিক কন্ট্রোলের রাডার স্ক্রিন থেকে পুরোপুরি উধাও হয়ে গেল দুর্ভাগা ফ্লাইটটি। চিরকালের মতো। নির্ধারিত পথ অনুসরণ না করায় মিলিটারি রাডার ওকে ফলো করতে শুরু করে। কিন্তু ২:২২ নাগাদ আন্দামান সাগরে পৌঁছবার পর এটি মিলিটারি রাডারের পরিসীমার বাইরে বেরিয়ে যায়। মালয়েশিয়ার ওই বিমানে বারোজন মালয় ক্রু সদস্য আর ২২৭ জন শিশুসহ সাধারণ যাত্রী ছিল। কে জানে তারা কোথায় চিরতরে মিলিয়ে গেল। পরের দিন থেকেই গাল্ফ অফ থাইল্যান্ড থেকে দক্ষিণ চিনাসাগর তোলপাড় করে খোঁজ শুরু হয়ে গেল। প্রথমে খোঁজা হল, যেখানে শেষবারের মতো এর সিগন্যাল মিলেছিল। কোনও হদিশ মিলল না। তারপর এদিক-ওদিক সব সম্ভাব্য জায়গায়ই ছড়িয়ে পড়ল অনুসন্ধানকারী দল। স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া তথ্য খতিয়ে দেখা গেল সকাল ৮:১৯ পর্যন্ত নাকি উড়ান জারি রেখেছিল প্লেনটি। ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ দিকে গিয়েছিল, এ তথ্যটুকুও পাওয়া গেল। কিন্তু ব্যস, ওই পর্যন্তই। আর কিছু নয়। ২৪ মার্চ মালয়েশিয়া সরকার ঘোষণা করল, ফ্লাইট ৩৭০ ভারত মহাসাগরেই ডুবে গিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া তথ্য। ভারত মহাসাগরের উপরই ওর শেষ চিহ্ন মিলেছে। সেখানে তো আর ল্যান্ড করার মতো কোনও জমি নেই। অতএব...

তা সত্ত্বেও সরকারের পক্ষ থেকে ফরেন এভিয়েশন অফিসার ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তদন্ত কমিটি বসানো হয় অনুসন্ধানের জন্য। অবশেষে রিইউনিয়ন দ্বীপে ২৯ জুলাই, ২০১৫ সালে একটি বিমানের টুকরো পাওয়া গেল। পুরনো নথি মিলিয়ে দেখা গেল, এটি ওই বিমান হলেও হতে পারে। কিন্তু বিমানের ব্ল্যাকবক্স, যেখানে রেকর্ড করা থাকে পাইলটদের কথোপকথন, যা দেখে দুর্ঘটনায় পড়লে জানা যায় প্লেনটির ঠিক কী হয়েছিল, আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে নেওয়া যায়নি। অপ্রমাণটাই তৈরি করেছে নানা গল্প, ধোঁয়াশা। বিমানের কোনও পাইলট বা ক্রু কেন কোনও সিগন্যাল পাঠাল না, তা নিয়ে রহস্য গাঢ় হয়। কোনও খারাপ আবহাওয়ার কথা রাডারে কেন ধরা পড়ল না বা প্লেনটির টেকনিক্যাল ত্রুটির কথা জানা গেল না, সে নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হল। শুধুমুধু প্লেনটা উধাও হওয়ার আগে কেন কাউকে কিছু জানাল না। ওই ফ্লাইটে দু'জন প্যাসেঞ্জারের পাসপোর্টে গন্ডগোল ছিল। ওদেরকে নিয়ে একটু সন্দেহ দানা বাঁধছিল। কোনও উগ্রপন্থী নয় তো? মালয় পুলিশ ক্যাপ্টেনের উপর খুব সন্দেহ করছিল। কিন্তু এদুটো ব্যাপারেও দৃঢ় প্রমাণ মিলল না। স্যাটেলাইটের অনেক খুঁটিনাটি বিচার করে শেষ তথ্য জানা গেল রাডারের রেঞ্জ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর সুমাত্রার উত্তর দিয়ে যাওয়ার পর বিমানটি দক্ষিণমুখী হয়ে টানা পাঁচ ঘণ্টা উড়েছিল। হয়তো যতক্ষণ সম্পূর্ণ জ্বালানিটা শেষ হয়নি। তারপরই পুরোটা অন্ধকার...

এইরকম দুর্ভাগ্য যাতে অন্য কোনও বিমানের হয়, তা ঠেকাতে ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে
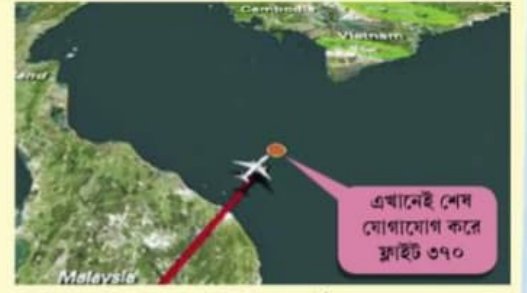
ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন এক নতুন নিয়ম ঘোষণা করল। যে-কোনও বিমানকেই তাদের অবস্থান ১৫ মিনিট অন্তর অফিসে রিপোর্ট করতে হবে। আর ফ্লাইট ৩৭০ নিয়ে হাজারও প্রশ্ন ভারত মহাসাগরের ঘন নীল জলেই মিশে গেল।

কতদিন থাকে হাতের ছাপ?

গত শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকার শিকাগো শহর। সাধারণ মানুষের ভিড়েই মিশে ছিলেন ফ্রান্সিস লেভি। ফায়ার ব্রিগেডের কর্মী ফ্রান্সিস হাসিখুশি আর আমুদে মানুষ ছিলেন। বিপদেআপদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। পাড়া-প্রতিবেশী, সহকর্মী সকলেই তাঁকে ভালবাসতেন। ১৯২৪ সালের ১৮ এপ্রিল। বসন্তকালের এক রোদ ঝকঝকে সকাল। রোজকার মতোই কাজে গিয়েছেন লেভি। হঠাৎই এক সহকর্মী, লেভির বন্ধু রোজকার মতো সুপ্রভাত জানিয়ে বিব্রত বোধ করলেন। যাব্বাবা, কী আবার হল? লেভির মুখে হাসি নেই। কোনও উত্তরও নেই। শরীরটরির খারাপ নাকি? এক মনে বেজায় গম্ভীর হয়ে শিকাগো ফায়ার ডিপার্টমেন্টের বিশাল এক কাচের জানলা পরিষ্কার করে চলেছেন। আবারও গ্রিট করলেন সেই বন্ধুটি। শুনতে পেল না নাকি? নাহ, উত্তর নেই। দরকার নেই। একটু খটকা আর অপমান নিয়েই বন্ধুটি তাঁর

কাজে চলে গেলেন। তিনি জানলেন না, তাঁর চলে যাওয়ার মিনিটকয়েকের মধ্যেই লেভি চেঁচিয়ে উঠবেন সবাইকে হতবাক করে। "বুঝতে পেরেছি। নিশ্চিত আমি। আজই আমার শেষ দিন।" সাতসকালে লেভির বেসামাল কাণ্ড সকলের তখনও হজম হয়নি, তারস্বরে বেজে উঠল ফোনটা। মনোযোগ ওদিকে ঘুরে গেল। দূরের এক বিল্ডিংয়ে আগুন লেগেছে। এখুনি বেরতে হবে। "তুমি যাবে তো?" এক সহকর্মী প্রশ্ন করেন লেভিকে। "হ্যাঁ, অবশ্যই," মাথা নেড়ে লেভি জবাব দেন। লেভি আবার স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে দেখে সহকর্মীরা স্বস্তি পেল। মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল কোনও কারণে। যাক বাবা, কর্মীরা সকলে ব্যস্ত হয়ে বেরনোর তোড়জোড় করতে লাগল। দমকলের গাড়ি টংটং করতে-করতে বেরিয়ে পড়ল মিনিটপাঁচেকের মধ্যেই।

উঁচু এক আকাশছোঁয়া বাড়ির উপরের তলায় আগুন লেগেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কাজে লেগে পড়ল সবাই। অভিজ্ঞ কর্মীরা বুঝতে পারলেন, ভয় নেই। অবস্থা কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে। কিন্তু হঠাৎই বাড়ির নীচের তলার জানলা দিয়ে বেরিয়ে এল নতুন এক লেলিহান আগুনের শিখা। নীচের তলায় আগুন লাগল কখন? কিছু বোঝার আগেই বাড়ির দেওয়াল আস্তে-আস্তে ধসে পড়তে লাগল। ভেঙে পড়ল ছাদের একাংশ। আগুন, কালো ধোঁয়া, দমবন্ধকর পরিবেশ। কিছুই দেখা গেল না খানিকক্ষণ। সব আগুনই একসমসয় নেভে। এও নিভল। দমকলকর্মীরা আবিষ্কার করলেন, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অনেকের মধ্যে লেভিও চাপা পড়েছেন। উদ্ধারের পর দেখা গেল, ফ্রান্সিস লেভির সকালের ঘোষণাই সত্যি হয়েছে। তিনি মারা গিয়েছেন।

পরের দিন দমকল অফিসে হাওয়া ভারী। শোকার্ত বন্ধুরা লেভির কথাই বলাবলি করছেন। এমন সময়, লেভির সেই বন্ধু, যিনি আগের দিন লেভিকে সুপ্রভাত জানিয়ে উত্তর না পেয়ে বিরক্ত হন, তাঁরই নজরে পড়ল কাচের জানলায় ফুটে রয়েছে ভারী অদ্ভুত এক হাতের ছাপ। আরে, এটা তো লেভি কাল সকালেই প্রাণপণে পরিষ্কার করেছিল। ওর হাতের ছাপ? কাচের জানলায় এতক্ষণ তো ছাপ থাকে না। বন্ধুটির বুক দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল। বেচারা! কী থেকে কী হয়ে গেল! ফাইফরমাশখাটা ছেলেটাকে ডেকে ভাল করে মুছতে বলে দিলেন। ওমা! অনেক রাত পর্যন্ত অফিসের সমস্ত দমকলকর্মীদের বিস্ফারিত চোখের সামনে প্রশ্নচিহ্নের মতোই জেগে রইল হাতের ছাপটি। অনেক মোছামুছিতেও, অনেক কেমিক্যালেও দাগটা ঠিক থেকে যাচ্ছে। বিস্ময়টা জেগে রইল আরও অনেকদিন। আস্তে-আস্তে ওই অফিসের লোকেরা ওটার কথা ভুলেও গেল। অভ্যস্ত হয়ে গেলে যা হয়। ১৯৪৪ সালে পর্যন্ত দাগটা ছিল। সেই বছর একদিন সকালে

সেই কাচে লেভির হাতের ছাপ

কাগজওয়ালা রোজকার মতো নীচের তলা থেকে কাগজটা উপরে ছুড়ে দিল। কী অবাক কাণ্ড! ওই আলতো আঘাতেই কেন কে জানে কাচের জানলাটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল, অদ্ভুত দাগটাকে নিয়ে। ২০ বছর পর। তবে ফ্রান্সিস লেভির শেষ স্মৃতিটুকু বিস্ময় জাগিয়েই রাখল ইতিহাসের পাতায়।

ঘুমের গ্রাম কলাচি

ঘুমিয়ে পড়লে আমরা ঘুমের দেশে চলে যেতে পারি। কিন্তু জেগে-জেগে কি কোনও ঘুমের দেশে যাওয়া যায়? অবাক লাগলেও কাজাখস্থানের কলাচি গ্রাম কিন্তু সত্যিই এক ঘুমের দেশ। কিছু কথা শুনে নামটা সার্থক কিনা তোমরাই বিচার কোরো। রাত বাড়ার দরকার নেই। খুব খাটাখাটনিরও দরকার নেই। ওখানে পা দিলেই নাকি চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। ওখানকার অধিবাসী যারা, তারা নাকি দিনের বেলাতেই পড়ে-পড়ে ঘুমোয় ঘণ্টার পর-ঘণ্টা। কেউ-কেউ নাকি জেগে উঠে আবিষ্কার করে, এর মধ্যে পেরিয়ে গিয়েছে বেশ ক'টি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। অর্থাৎ অঘোর ঘুমে চলে গিয়েছে গোটাকয়েক আস্ত দিন। ওখানকার বাসিন্দারা নাকি যে-কোনও সময়েই কাজের মাঝখানে ঘুমোতে শুরু করে দেন। খুবই বিপজ্জনক, তাই না? মানে ভাগ্যিস এরকমটা অন্য কোথাও হয় না। তা হলে গাড়ি চালাতে-চালাতে বা পরীক্ষা দিতে-দিতে ঘুমিয়ে পড়লে কী হত? এই তো বেশিদিন আগের কথা নয়। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একদল স্কুলের বাচ্চা খলবল করতে-করতে ফিরছিল। সেদিন স্কুলে সেশন শুরু হল। নতুন বছরের নতুন ক্লাসের প্রথম দিন। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে, গল্পগুজব করতে-করতে আসছে ফুটফুটে একঝাঁক শিশু। হঠাৎই চোখে এসে কে আলতো করে ছুঁইয়ে দিল রূপকথার অচিন রাজকন্যার মতো সোনার কাঠি! ব্যস, সদলবলে সমবেত ভোঁসভোঁস শুরু হয়ে গেল রাস্তার মাঝখানেই। অনেক ডাক্তার মেডিক্যাল টিম নিয়ে এসে ঘুরে গিয়েছেন। দিব্যি সুন্দর সুজলা-সুফলা একটা নিরিবিলি গ্রাম। আর-পাঁচটা গ্রামের থেকে অন্য কোনও বিশেষত্ব তাঁদের নজরে পড়েনি। হাওয়া, জলেও পাওয়া যায়নি কোনও

অবাঞ্ছিত পদার্থের খোঁজ। সুতরাং সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। তবে যারা এরকম অদ্ভুতুড়ে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছে, তারা নাকি জেগে উঠে খুবই আতঙ্কিত হয়েছে। কেন? কারণ, এই ঘুমিয়ে পড়ার পর তাদের স্মৃতিভ্রংশ, ভার্টিগো, একটু বমি-বমি ভাব ইত্যাদিও হয়েছে। তাই এই ঘুমটাকে পুরোপুরি নির্দোষও বলা যায় না। কিছু মানুষের মস্তিষ্ক সাময়িকভাবে বিকল ও ছোটখাট স্ট্রোকও হয়েছে। আর হঠাৎ করে কোনও কারণ ছাড়া ঘুমিয়ে পড়লে জেগে ওঠার পর আমাদেরও কেমন ভিরকুট্টি লাগবে, তাই না? এই অজানা ঘুম-রোগের জীবাণু কি তা হলে গ্রামের বাতাসেই? ভয়ে স্থায়ী বাসিন্দারাও অনেকে পাততাড়ি গুটিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষাও হয়েছে ঢের। ২০১৫ সালে বাতাসে কার্বন মনোক্সাইডের প্রবল উপস্থিতি টের পাওয়া গিয়েছিল, এছাড়া কোনও রেডিয়েশনের লেশ ছিল না। তবে এই যুক্তি দিয়ে গবেষকরা এই ঘুমরোগের কোনও কারণ বের করতে পারেননি।

এ এক আগুনে মহিলা

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডে জো গিরারডেলি বেশ চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছিলেন। ১৭৮০-র দশকে ইতালিতে এঁর জন্মের খবর মিলছে। ১৮১০ নাগাদ তিনি ইংল্যান্ডে পৌঁছে খেলা দেখাতে শুরু করেন। সত্যিকারের আগুনে মহিলা যাকে বলে! কেমিস্ট থেকে গবেষক, কেউই ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি, কী মন্ত্রবলে বা সায়েন্সের কী কারিকুরিতে তিনি এইসব সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড করতেন। কোনও ভণ্ডামি বা লোকঠকানো ব্যাপার ছিল না। ম্যাজিক তো নয়ই। অনেক অবিশ্বাসীরাও নাকি প্রমাণ করতে পারেননি জো গিয়ারডেলি ধোঁকা দেন। তাঁর শো ছিল গায়ের লোম খাড়া করার মতো। বাচ্চারা চোখ বন্ধ করে ফেলত। কড়াই থেকে তুলে খাবার তিনি খেয়ে নিতেন। জ্বালাপোড়া কিছুই হত না। লোকেরা যারা তাঁর খেলা দেখত, নিজের চোখকে বিশ্বাস করত না। নাইট্রিক অ্যাসিড মুখে নিয়ে কুলকুচি করে ফেলতেন। মুখের মধ্যে যে অ্যাসিডই আছে, অন্য কিছু নয় প্রমাণ করার জন্য তিনি মুখ থেকে সরাসরি কোনও লোহা বা অন্য ধাতুর উপর অ্যাসিড ফেলতেন। লোহা সঙ্গে-সঙ্গে গলে যেত। কিন্তু মুখের ভিতর অবিকল থাকত। তাঁর পরের খেলাটি ছিল আরও চমকপ্রদ। স্টেজের মধ্যে তেল ফুটত। তার মধ্যে তিনি ডিম ভেঙে দিতেন। ডিম রান্না হয়ে যাওয়ার পর মুখের মধ্যে সেই গরম তেল নিতেন। তারপর এদিক-ওদিক ঘুরে কাঠের উপর ফেলতেই দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠত। এখানেই থামতেন না। তাঁর প্রতিটা খেলাই ছিল আগেরটার চেয়ে আর-একটু ভয়ানক। তেলের পর আসত গরম মোম আর গলন্ত সিসা। ধাতু আগুনের উপর ধরে যখন লাল হয়ে যেত, তিনি নিজের ত্বকে, চুলে ঠেকাতেন। জিভও ঠেকাতেন। কিচ্ছু হত না। একটুকু পোড়ার দাগও ফুটত না কোথাও। শুধু একটা ছ্যাঁক শব্দ ভেসে আসত। কোনও গরম জিনিসকে ঠান্ডা কিছুর সঙ্গে ছোঁয়ালে যেমনটা হয়। প্রশ্নটা গাঢ় হচ্ছিল, এই পৃথিবীরই রক্তমাংসের মানুষ তিনি নাকি কোনও অশরীরী? ঠিক তেমন সময়ই লোককে মন্ত্রমুগ্ধ আর বিস্মিত করতে-করতে একদিন ইংল্যান্ড থেকে বেমালুম হারিয়ে যান জো। কোথায় যান কিচ্ছু জানা যায় না। তাঁর গা-ছমছমে ভয়ঙ্কর কাণ্ডের মতোই রহস্যে মোড়া থেকে যায় জোয়ের বাকি জীবনও।

ভূতুড়ে জঙ্গল

কাটা মুন্ডু ভাসতে-ভাসতে এগিয়ে আসছে। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে গায়ের রক্ত জল করা একটা বীভৎস আর্তনাদ। খানিক এগোতেই ধাক্কা খেতে হল একটা ভারী বস্তুর সঙ্গে। টর্চ জ্বেলে দেখতে গিয়েই হৃদপিণ্ড প্রায় গলার কাছে উঠে আসার জোগাড়। মৃতদেহ ঝুলছে গাছ থেকে। ট্রানসিলভানিয়ার হোয়া বাসাউ জঙ্গল নিয়ে এরকম অনেক কানাকানি শোনা যায়। সত্যতা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে, কিন্তু সত্যি জঙ্গলের গাছগুলো এমনিতেই ভীষণ অদ্ভুত। কেন এমন নুয়ে পড়েছে মাটির দিকে, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। পৃথিবীর অন্য কোনও জায়গায় এমন ভীষণদর্শন গাছ নেই। এটা তো আশ্চর্য বটেই, কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। ওখানে যারা বেড়াতে যায়, তারা শরীরে কোনও-কোনও অংশে অদ্ভুত পোড়া, জ্বালা নিয়ে ফেরে। কারও অভিজ্ঞতা তো আরও সাংঘাতিক। জঙ্গলের মধ্যে তারা যখন ঢুকেছে আর বেরিয়েছে, মধ্যিখানে রয়ে গিয়েছে অনেকখানি অজানা সময়। মাঝখানের স্মৃতিটুকু উধাও হয়েছে বলা যায়। স্থানীয় মানুষজন তো বনে ঢোকার কথা হলেই রামনাম (মানে, ওদের ভাষায় আর কী) জপেন। সত্যি-মিথ্যের তোয়াক্কা না করে পর্যটকদের বুক কাঁপিয়ে দেয় হাড়হিমকরা সব ভূতের গল্প। পাত্তা না দিলেও বিপদ। এক সাহসী মেষপালক নাকি একবার দু'শোর মতো বিশাল ভেড়ার পাল নিয়ে ঢুকে পড়েছিল জঙ্গলে। ভেড়ার পালসমেতই উধাও হয়ে যায় সে। ব্যাখ্যা মেলেনি আজও।

এ আবার কোনদেশি প্রাণী

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। সিঙ্গাপুরের বাকিত তিমাহ বৃষ্টি অরণ্যের কাছে জাপানি সেনারা অস্থায়ী ছাউনি করে রয়েছে। তখন রাত হয়ে এসেছে। এদিক-ওদিক আগুন জ্বালিয়ে বসে গুলতানি করছে। একজন সেনা একটু দূরে বসে মাউথঅর্গানে সুর

হোইয়া বাসি জঙ্গল

তুলছিল। হঠাৎ পায়ের সামনে একটা ছায়া এসে পড়ল। সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসার আগেই চকিতে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের ভিতর। কিছুদিন পরে আবার এক সেনা রাতে দেখল এই ছায়ার মালকিনকে। অনেকটা যেন গোরিলার মতো। কিন্তু এ অঞ্চলে তো গোরিলা নেই। তা হলে প্রায় সাড়ে ছয় ফুটের মতো লম্বা আর সর্বাঙ্গ ধূসর লোমে ঢাকা প্রাণীটি কে? প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পেরিয়ে গেল তারপর। এর মধ্যে কি প্রাণীটি আর দেখা যায়নি? মাঝেমধ্যেই অনেকের সঙ্গেই মোলাকাত হয়েছে ওর। কেউ-কেউ বলেছেন, ম্যাস্যাক বলে এক ধরনের বাঁদরকে হয়তো সেনা থেকে সাধারণ মানুষ অন্য কিছু ভেবে গুলিয়েছেন। যাই হোক, ২০০৭ সালে এক দুঃসাহসী অভিযাত্রীর দল এখানে হিচহাইক করতে এসেছিল। তাদের বয়ানে এক অদ্ভুত ঘটনার জানা যায়। জঙ্গলের কাছেই এক ট্যাক্সির সঙ্গে এক বিশালাকায় প্রাণীর ধাক্কা লাগে। নেমে দেখা যায় অদ্ভুতদর্শন গোরিলার মতো এক প্রাণী মরে পড়ে আছে। আর একজন কেউ ডাস্টবিনের কাছে বসেছিল। টুরিস্টদের টর্চের আলো গায়ে পড়তেই পালায়। কে এ? জানা যায়নি এখনও।

রহস্যের নাম ছন্দ-তাল

১৫১৮ সালের তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যের এক রাজ্য স্ট্রাসবুর্গ। জুলাই মাস। মনোরম আবহাওয়া। দোকানপাট, বাড়িতে সবাই কাজে ব্যস্ত। ট্রোফি নামের এক সুন্দরী মহিলা খামোকা রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ নেচে উঠলেন। সবাই চমকে উঠল। কিন্তু তার পায়ের জাদুতে যেন কিসের এক নেশা। অচিরেই নেশাটা ধরল। আশপাশের আরও কয়েকজনের পায়ে ছন্দ ফুটল। আস্তে-আস্তে পাশের বাড়ির জানলা দিয়ে যে মেয়েটা অনেকক্ষণ ধরে দেখছিল, বা ঘোড়ার গাড়ি চড়ে যে দম্পতি গির্জায় যাচ্ছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই এসে ট্রোফির নাচে যোগ দিল। তাদের নাচ চলতেই লাগল। কিসের যেন পাগলামিতে ভর দিয়ে ব্যস্ত শহরের মাঝখানে এক অপরূপ রঙ্গমঞ্চ তৈরি হয়ে গেল। সূর্য ঢলে পড়ল। রাত বাড়ল। ওমা, দেখতে-দেখতে পরের দিনও পাহাড়ের গায়ে আবার কমলা রং ধরল। তখনও মানুষজন মোহিত হয়ে নৃত্যরত। এসে যোগ দিয়েছে আরও কতজন। এক সপ্তাহের মধ্যে দেখা গেল ৩৪ হয়ে গিয়েছে সংখ্যাটা। এক মাস পার হল। স্ট্রাসবুর্গবাসীরা বিস্ময়ে চোখ কচলাতে-কচলাতে দেখল, প্রায় ৪০০ জন মানুষ মধুর ছন্দে নেচে চলেছে রাস্তার মাঝখানে। প্রথম যিনি নাচছিলেন, সেই ট্রোফি একসপ্তাহ পরেই কিন্তু চলে গিয়েছেন আসর ছেড়ে। কিন্তু তার নাচের স্পর্শেই নাচ চলেছে একটানা। ক্ষুধা-তৃষ্ণা উবে গিয়েছে সকলের। কিসের যেন দৈবশক্তি ভর করেছে। আধিভৌতিক দেবতার কারসাজি নাকি? দেখা গেল, না, মানুষ শেষ পর্যন্ত মানুষই থাকল। একসময় অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ল। পরিশ্রমে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কেউ-কেউ। কেউ আর উঠলও না। জানা গেল স্ট্রোকে মৃত্যু হয়েছে তাদের।

ইতিহাসে এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় ডান্স এপিডেমিক বা নাচের মহামারী নামে। অনেক সাক্ষীই লিখে গিয়েছে এই ঘটনার কথা। কিন্তু রহস্যটা আজও ভেদ হয়নি। জানা যায়নি কেনই বা অত মানুষ এমন উন্মত্তের মতো নাচতে শুরু করে। এমনকী, মৃত্যু দোরগোড়ায় চলে এলেও তারা নাচ থামায় না। শহরের অনেকেই কোনও অলৌকিক শক্তির কুপ্রভাব বলে মনে করেছিল। কিন্তু তখনকার ডাক্তাররা হেসে উড়িয়ে দেন। মাথা গরম হলে নাকি এমন আজগুবি কাণ্ড মানুষ করতে পারে। কিন্তু এক সঙ্গে এত মানুষের মাথা কী করে গরম হয়, সে ভাবনার বিষয়। শহরের মেয়র এই সমবেত নৃত্যে খুবই উৎসাহ দেন। স্থানীয় বাজনদারদের টাকাপয়সাও দেওয়া হয়, যাতে নাচের সঙ্গে ঠিকঠাক সঙ্গত করে। এমনকী, মঞ্চও বানিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা ভাবছিলেন, নেহাত শখে একটু আমোদআহ্লাদ হচ্ছে। এর ফল এমন মৃত্যুর মতো মারাত্মক হতে পারে, তা ছিল ধারণার বাইরে। টানা এক মাস নাচ কিন্তু একজন ম্যারাথন দৌড়বিদের পরিশ্রমকেও হার মানিয়ে দেয়। তাই এতটা পরিশ্রম মানুষগুলো অতদিন করতে পেরেছিল ঠিক কী শক্তিতে বা ইচ্ছেয়, তা আজও ইতিহাসের এক বিচিত্র প্রশ্ন হয়ে আছে।

প্রশ্নের যে উত্তর মিলবেই, এমনটাই তো চিরকেলে নিয়ম। তাই উত্তর না মিললে খচখচ করবেই। এই খচখচটুকুর জন্যই উপরের ঘটনা বা জায়গাগুলোর লোকের কাছে কদর। ওয়াও সিগন্যাল, শ্রাউড অফ তুরিন, ক্রিপ্টোজ...অমীমাংসিত রহস্যের সংখ্যা অজস্র। তার মধ্যে গোটাকয়েক রইল এখানে। একটা কথা তো মানবে, হাজার সাধারণ ঘটনা আর জায়গার ভিড়ে এই অন্য রকম রহস্যময় ঘটনাগুলোই কিন্তু পৃথিবীর একঘেয়ে ইতিহাসকে করে তুলেছে অনেক বেশি রোমাঞ্চকর, রোমহর্ষক। তাই এদের গুরুত্ব ভুললে চলবে না কিন্তু।

নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ

হুগলির নবগ্রামের এই স্কুল দীর্ঘদিন ধরে ভাল ছাত্র গড়ে তুলছে। লিখেছেন **সিজার বাগচী**

দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের বহু মানুষজন চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে। তাঁদের অনেকে এসে হাজির হন কোন্নগরের কাছে নবগ্রামে। সেই জায়গায় গড়ে ওঠে কলোনি। আর কলোনির ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর উদ্দেশ্যেই ১৯৪৮ সালে তৈরি করা হয় ছোট্ট একটি স্কুল। সেই স্কুলই ১৯৫৩ সালের ১ জানুয়ারি অনুমোদন পায় নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ হিসেবে। আর এখন? পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয় এই স্কুলে। ছাত্রের সংখ্যায় প্রায় চোদ্দোশো। এই স্কুলে অবশ্য বয়স্কশিক্ষা এবং বৃত্তিশিক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে।
নবগ্রাম বিদ্যাপীঠে ঢুকলেই চোখে পড়ে এক ছিমছাম স্কুল বিল্ডিং। রয়েছে অডিটোরিয়াম। খেলার জায়গা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডঃ দিলীপ মুখোপাধ্যায় বললেন, "আমাদের স্কুলে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে প্রায় একশো শতাংশ রেজ়াল্ট হয়।"
হুগলি জেলায় ভাল স্কুল হিসেবে খ্যাতি আছে নবগ্রাম বিদ্যাপীঠের। শুধু নবগ্রাম থেকেই নয়, আশপাশের এলাকা যেমন কানাইপুর, মীরপুর, ডানকুনি, বামুনারি, রিষড়া, কোন্নগর, এমনকী হিন্দমোটর থেকেও ছাত্ররা এই স্কুলে পড়তে আসে। দিলীপবাবু জানালেন, "অভিভাবকদের সঙ্গেও বসা হয়। একবার সব অভিভাবকদের নিয়ে, আর-একবার ক্লাসভিত্তিক অভিভাবকদের নিয়ে।"
আর এই বসার ফলে অভিভাবকরাও সহজে জানতে পারেন স্কুলে তাঁদের ছেলেরা কেমন লেখাপড়া করছে।
লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলোতেও এই স্কুলের সুনাম অক্ষুণ্ণ। প্রধান শিক্ষকের অফিসে সাজানো নানা ট্রোফিই প্রমাণ করে ছেলেরা খেলায় কতটা পারদর্শী। মুখ্যত ফুটবল, ক্রিকেট খেলা হলেও এই স্কুলের ছেলেরা টেবিল টেনিস, অ্যাথলেটিক্সেও এগিয়ে। এই স্কুলের ছাত্র সুকুঞ্জ হাজরা সাঁতারে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। টেবিল টেনিসে রয়েছে রণজিৎ সেন, অয়ন পাল।
এই সব তথ্য থেকে বোঝা যায় আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ কীভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

ফোটো: সিজার বাগচী

আমার প্রিয়

তোমরা যারা আনন্দমেলার দফতরে তোমাদের প্রিয় মানুষ, খাবার, বেড়ানোর জায়গা ইত্যাদি নিয়ে লিখেছিলে, তাদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে ভাল হয়েছে যাদের লেখা, সেগুলো প্রকাশিত হল।

আমার প্রিয় শিক্ষক

আমি পাঠভবন, বিশ্বভারতীর চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। প্রথম পর্বে আমার প্রিয় শিক্ষক ও তড়িৎদার ক্লাস। তড়িৎদা ক্লাসে এসে বলেন, "আমি খাতা আনতে যাওয়ার আগে সহজপাঠ বের হওয়া চাই।" কোনও-কোনওদিন বলেন যে, "আবোলতাবোল বের করো।" বা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছেলেদের রামায়ণ' বের করতেও বলেন। সেদিনকে তড়িৎদা বলেন যে, আবোলতাবোলের 'খিচুড়ি' বলে ছড়াটা বের করতে। তড়িৎদা রোজ ক্লাসে এসে একটু মুচকি হেসে আমাদের মন জয় করে নেন। ছাত্রছাত্রীদের কীরকম করে শিক্ষা দিতে হয়, তড়িৎদা সেটা খুব ভাল করে জানেন। একদিন আমি অনীশের সঙ্গে ক্লাসে কথা বলছিলাম। তড়িৎদা আমার দিকে বড়-বড় চোখ করে তাকালেন, আমি ভয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম। পরে তড়িৎদা আমাকে সিংহসদনের পিছনের অফিসে ডেকে এনে আমার গাল টিপে আদর করে একটা চকোলেট হাতে ধরিয়ে দিলেন। আমার তড়িৎদার উপর সব রাগ গলে জল হয়ে গেল। আমরা বানান লেখার সময় মাঝে-মাঝে চন্দ্রবিন্দু দিতে ভুলে যাই। তাই তড়িৎদা বলেন যে, "তোমাদের ভূতের সঙ্গে ঝগড়া নাকি?" তড়িৎদা আমার প্রিয় শিক্ষক। তড়িৎদার পোশাক, কথা বলা আমার খুব ভাল লাগে। আমি বড় হয়ে তড়িৎদার মতো হব।

শুভম রায়
চতুর্থ শ্রেণি, পাঠভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

আমার প্রিয় বই

গল্পের বই আমার সবচেয়ে প্রিয়। বিভিন্ন গল্পের বইয়ের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের লেখা ফেলুদার গল্পই আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি। ফেলুদা সিরিজের সব গল্পই আমার পড়া। এই প্রদোষচন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদা জোড়া খুনের রহস্য ছাড়া বাকি সব রহস্যেরই সমাধান করতে পেরেছে। ফেলুদার ভাই তোপসে তাদের সেইসব অ্যাডভেঞ্চারের গল্প আমাদের জানিয়েছে। এই গল্পের অন্যতম চরিত্র লালমোহন গাঙ্গুলিও খুব আকর্ষণীয়। জটায়ু ছদ্মনামে 'হংকং-এ হিমশিম'-এর মতো নানা গল্প তিনি লিখেছেন। এই ফেলুদার গল্প পড়ে শুধু যে আনন্দ পাওয়া যায় তাই নয়, সেই সঙ্গে নানা অজানা তথ্যও জানতে পারা যায়। এই থ্রি মাসকেটিয়ার্সের রহস্য, রোমাঞ্চে ভরা গল্পগুলো যতবার ইচ্ছে পড়লেও মন কিছুতেই ভরতে চায় না।

রোহিত বসু
অষ্টম শ্রেণি, শিক্ষা নিকেতন হাই স্কুল, কলকাতা-৭৪।

আমার প্রিয় ছবি
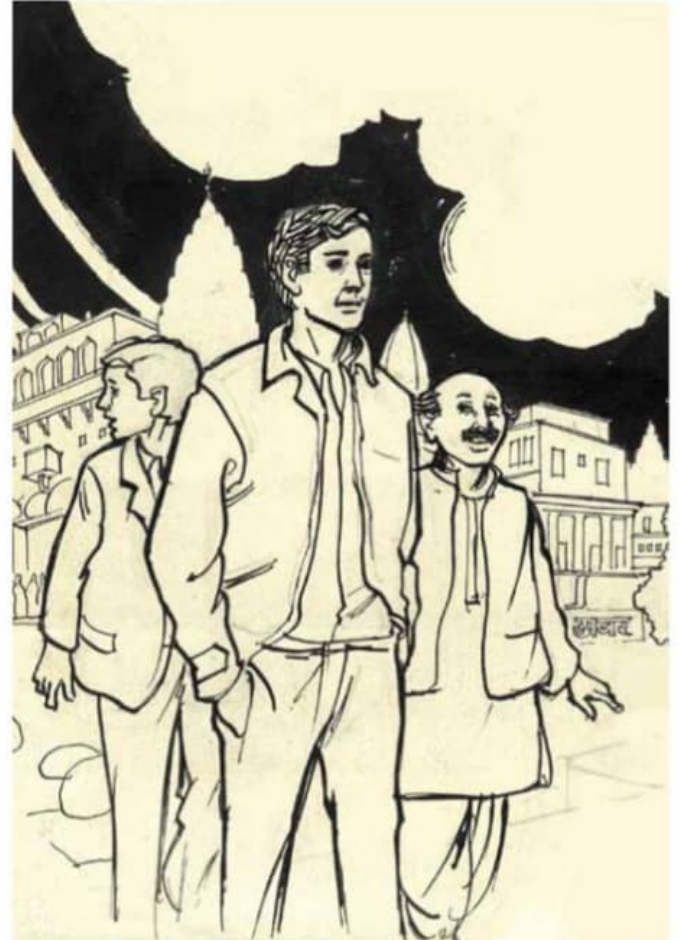
আমার প্রিয় ছবি হল লিওনার্দো দি ভিঞ্চির সেই বিখ্যাত সৃষ্টি, 'মোনালিসা'।
এটা আমার পছন্দ শুধু যে আমার দিদির নাম মোনালিসা সেজন্য নয়।
এই ছবিটার দিকে তুমি যেদিক থেকেই তাকাও না কেন, মনে হবে যেন ছবিটি তোমার দিকেই তাকিয়ে আছে। ওর দৃষ্টিতে এক অদ্ভুত ভাষা আছে। যেন কিছু বলতে চায় ও। কী বলে? সেটা খুঁজে নিতে হবে তোমাকেই। ওর ঠোঁটে এক অদ্ভুত সুন্দর হাসি আছে, যা অন্য কেউ চেষ্টা করেও তেমন হাসি হাসতে পারবে না। ওর চাহনি, ওর হাসি যেন আমাকে কিছু একটা বলতে চায়। কী বলে? আবার সেই প্রশ্ন! আরে, সেই উত্তরটাই তো তোমাকে খুঁজে নিতে হবে।

বিদিশা পোয়ালী
অষ্টম শ্রেণি, বড়িশা গার্লস হাই স্কুল, ঠাকুরপুকুর।

আমার প্রিয় গান

খুব মনখারাপ হলে বা কোনও কঠিন সমস্যায় পড়লে আমি একটা গানের কথা ভাবি। এই গানটা হল 'সাউন্ড অফ মিউজ়িক' সিনেমার 'মাই ফেভারিট থিংস'। শুধু এই গানটার জন্যই সিনেমাটা বারবার দেখি। মারিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করা জুলি অ্যান্ড্রুজ় নিজেই এই গানটি গেয়েছেন। গানের সুরটা আমার প্রিয়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি প্রিয় গানের কথাগুলো। গানটিতে মারিয়া বলেছে, যখনই তার জীবনে খারাপ কিছু ঘটে বা তার মনখারাপ হয়, তখন সে শুধু তার প্রিয় জিনিসগুলোর কথা ভাবে। আমিও চেষ্টা করি এভাবেই নিজের কষ্টগুলো মুছে ফেলতে। মারিয়ার প্রিয় 'চাঁদ আর উড়ন্ত হাঁস', 'গোলাপের পাপড়িতে বৃষ্টির ফোঁটা', 'নুডল্স', 'উপহারের মোড়ক' ইত্যাদির কথা ভাবলে আমারও মনটা খুশিতে ভরে যায়।

হিমাদ্রি মুখোপাধ্যায়
ষষ্ঠ শ্রেণি, হেরিটেজ আকাদেমি হাই স্কুল, হাওড়া।

আমার প্রিয় মাছ

আমাদের পরিবার বাঙাল না ঘটি, তা আমি জানি না। তবে খাঁটি ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার। ফলে স্বাভাবিকভাবে ইলিশের কদর একটু বেশিই আমাদের বাড়িতে। অন্য মাছও খাওয়া হয়, তবে ইলিশ ইজ় ইলিশ। এর উপরে কোনও কথা হয় না। হবেও না। ইলিশের স্বাদ আর গন্ধের জন্য অন্য সব বাঙালির মতো তা আমারও প্রিয় মাছ। যারা কাঁটার জন্য ইলিশ খায় না, কী মিসই না করে, ইস! ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে। যদি তারা একদিন খিচুড়ি আর ইলিশমাছ ভাজা বা সর্ষে ইলিশ খায় তবে আর এই মিস করবে না। তখন তারা নিয়মিত ইলিশ খেতে চাইবে। তা ছাড়া ইলিশের জনপ্রিয়তা এত যে, কোনও বিদেশি যদি এদেশে

আসে সেও কিন্তু ইলিশমাছ খেতে চায়। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ফুটবল ম্যাচকে আমরা ডার্বি বলে থাকি। ডার্বির সময় বাবা বাড়িতে ইলিশ আনবেনই আর মায়ের হাতে পড়ে সেগুলো হয়ে উঠে অমৃত। আরে বাবা এই ইলিশ ছিল তো বলেই গান ছিল, "মাছের রাজা ইলিশ আর খেলার রাজা ফুটবল / আর সেই খেলাতে...আমার ইস্টবেঙ্গল।" ইলিশের কোনও বিকল্প হয় না।

মুকুল শীল
অষ্টম শ্রেণি, ধারেন্দা হাই স্কুল, গাইদোয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর

আমার প্রিয় খেলা

বিশ্বের সবারই একটা প্রিয় বিষয় থাকে। আমারও আছে। আমার প্রিয় খেলা ক্রিকেট। ক্রিকেটের নামটা শুনলেই আমার মনে হয় যাই মাঠে নেমে যাই। আমি প্রধানত ব্যাটসম্যান। কিন্তু ভাল বল করি বলে সবাই বলও করতে বলে। ক্রিকেটের ব্যাট দেখলেই আমার শরীরটা চাঙ্গা হয়ে যায়। গতবার একটা সেমি ডিউজের ব্যাট কিনে বলটাকে ফাটিয়েই দিয়েছিলাম। যখনই লুজ় বল পড়ে, আমার কবজি তার খেল দেখায়। ব্যাট করতে আমার বড়ই ভাল লাগে। প্রত্যেকটা শটে নিজের সমস্ত জোর লাগিয়ে দিই। বোলারকে ছয়, চার মারতে আমার থেকে বেশি আনন্দ আর বোধ হয় কেউ পায় না। প্রত্যেকটা শটেই আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে ওঠে। আমি সব থেকে ভাল ক্রিকেটই খেলি। এটাই আমার প্রিয় খেলা।

সোমঋক বন্দ্যোপাধ্যায়
সপ্তম শ্রেণি, সেন্ট জ়েভিয়ার্স হাই স্কুল, বাঁকুড়া।

আমার প্রিয় মানুষ

আমার প্রিয় মানুষ হল আমাদের স্কুলের ক্লাস ইলেভেনের অ্যাথেনা চৌধুরী। ও একজন খুব ভাল মানুষ। ওর হাসিটা দেখলেই আমার ভীষণ ভাল লাগে। ও আমার সঙ্গে গল্প করলে আমার ভীষণ ভাল লাগে। অ্যাথেনাদি অ্যাবসেন্ট হলে, স্কুলটা ফাঁকা লাগে। ও অযথা রেগে যায় না। ও একদম পাকা নয়। ও সবার সঙ্গেই গল্প করে। ও একদম পার্শিয়ালিটি করে না। ওকে কেন জানি না বাকি ক্লাস ইলেভেনের ছাত্রীদের চেয়ে আলাদা মনে হয়। ওর গান করা ও তারই সঙ্গে গিটার বাজানো শুনলে আমার মনটা ভরে যায়। ও লেখাপড়াতেও খুব ভাল। এই সব কারণে আমার অ্যাথেনাদিকে ভীষণভাবে ভাল লাগে।

ঋতচেতা সিংহ
ষষ্ঠ শ্রেণি, সেন্ট জোসেফস কনভেন্ট, চন্দননগর।

আমার প্রিয় নাটক

আমার প্রিয় নাটক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘স্মৃতিধরস্যার’। এই নাটকটি এই বছর আমাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নাটকের নাম শুনেই বোঝা যায় যে, এই নাটকের মূল চরিত্র স্মৃতিধরস্যার। স্মৃতিধরস্যার হলেন একজন অঙ্কপাগল স্যার। অঙ্কপাগল স্যারের পাগলামির দৌরাত্ম্যে তাঁর স্ত্রী সরলা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। স্মৃতিধরস্যার অঙ্ককে ভালবাসেন, অঙ্কই তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, নীতি। তাই তাঁর ছেলের নাম রেখেছেন দশমিক। এই নাটকে স্মৃতিধরস্যারের ভুলোমন আমাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু এই ভুলোমনের জন্যই শেষ পর্যন্ত তাঁর বাড়িঘরে চুরি হয়ে গেল। তবে, খুদে বন্ধুরা, তোমাদের বলছি, তোমাদের যেন আবার এই রকম অর্থাৎ স্মৃতিধরস্যারের মতো অবস্থা না হয়!

উষসী ঘোষ
সপ্তম শ্রেণি, গোপালী আই এম হাইস্কুল, খড়গপুর।

আমার প্রিয় গৃহপালিত পশু হল কুকুরছানা। আমার দুটো কুকুরছানা আছে। একটার নাম টম, আর-একটা জেরি। অর্থাৎ টম অ্যান্ড জেরি। টিভিতে টম অ্যান্ড জেরির কার্টুন যেমন সুন্দর, তেমনই সুন্দর ওই কুকুরছানাদুটো। আবার দুষ্টুও। ওদের দেখলেই আমার টিভিতে দেখা টম অ্যান্ড জেরির মুখ মনে পড়ে।

প্রিয় গৃহপালিত পশু

ওরা দু'জনে এখনও ছোটই। দু'মাস বয়স ওদের। তবে খুব দুষ্টু। ওরা দুধ খায়, তা ছাড়া ভাত, মাছ, মাংস সব খায়। বাবা বাজার করে নিয়ে এলে বাজারের থলেটা নিয়ে টানাটানি শুরু করে দেয়। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই রান্নাঘরে দৌড়য় আটার রুটি খাবে বলে। তারপর সারাদিন দুষ্টুমি করে বেড়ায়। দুপুরে চিকেন হলে তো কথাই নেই। তবে নিরামিষ ভাত কখনও চলবে না। বিকেলে দুধ আর বিস্কুট খায়।

রাতে ভাতও খায়, রুটিও খায়। মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসে।

ওদের একজনের গায়ের রং কালো। অন্যজনের লাল। খুব ভাল দু'জন।

অগ্নিশ রায়

সপ্তম শ্রেণি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, বর্ধমান।

আমার প্রিয় খাবার

আমার প্রিয় খাবার দুধ। একথা শুনে তোমরা সবাই খুব অবাক হবে। কারণ, কোনও বাচ্চাই দুধ খেতে ভালবাসে না। কিন্তু আমি দুধ খেতে খুব ভালবাসি। সকলের মা সকলকে জোর করে দুধ খাওয়ায়। কিন্তু আমার মা আমাকে দুধ খেতেই দেন না। তাই মা যখন বাড়িতে থাকেন না, আমি তখন লুকিয়ে-লুকিয়ে দুধ খেয়ে নিই। রাতে মা দই বানানোর জন্য যখন দুধ ফোটান, তখন আমার ঘন দুধের সেই গন্ধটা খুব ভাল লাগে। আমি রাবড়ি, দই, রসমালাই খেতেও ভালবাসি। আমি দুধ খেতে ভালবাসি বলে বাড়ির সবাই আমাকে বিড়াল বলে।

দিনমান কর
পঞ্চম শ্রেণি, বারাসত প্যারীচরণ সরকার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা।

প্রিয় বেড়ানোর জায়গা

আমার প্রিয় বেড়ানোর জায়গা আমার মামার বাড়ি নদিয়া জেলার ধুবুলিয়া স্টেশনের কাছেই বেলপুকুর গ্রামে। গ্রামটি বেশ বড়। চতুর্দিকে বাড়ির ফাঁকে-ফাঁকে শুধুই গাছ। একটু দূরে শুধুই ধানখেত, গমখেত, যবখেত ইত্যাদি। গ্রামের টাটকা সবজি বড় আকর্ষণ বিশাল বড় লাইব্রেরি। পাশের গ্রাম থেকে অনেকেই বই পালটাতে আসে ও পড়তে আসে। আমিও গেলে বই পড়ি। এই গ্রামের কালীপুজো বিখ্যাত। এছাড়া এই গ্রামে অনেক বড়-বড় শিব মন্দির আছে। এছাড়া এখানে শ্রীচৈতন্যের মামার বাড়ি নীলাম্বর চক্রবর্তীর ভিটেতে একটি নিমকাঠের কৃষ্ণ আছে

ও ফলের স্বাদ আমাদের শহরের থেকে অন্য রকম। গ্রামের পুকুরের মাছ খুব স্বাদের। গ্রামের প্রতিটি মানুষ সরল ও সাদাসিধে। ওখানে অনেক প্রাইমারি ও হাই স্কুল আছে, কিন্তু কোনও স্কুলের নির্দিষ্ট পোশাক নেই। এই গ্রামে ছোট হাসপাতাল, পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক (নদিয়া গ্রামীণ ব্যাঙ্ক) আছে। গ্রামের সবচেয়ে যা পরিক্রমা করতে প্রতি বছর দোলের সময় নবদ্বীপ ও মায়াপুরের মঠের হাজার-হাজার পুণ্যার্থী আসে। মামার বাড়ির সবাই ভাল, তাই এই গ্রামটি আমার প্রিয়।

অর্ণব চোংদার
অষ্টম শ্রেণি, বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়। কলকাতা ৭০০০৫৬।

আমার প্রিয় জামা

আমার একটা ঘন নীল রঙের শার্ট আছে। সেটা আমার খুবই পছন্দের। একদম একই রঙের একটা জামা আমার বন্ধুরও আছে। পুজোর সময় ওর জামাটা দেখে আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু বাবা-মাকে বলতে পারিনি। বললেই ওঁরা বলবেন, অন্যের জিনিস দেখে চাইতে নেই। কিন্তু কী করে বোঝাব জামাটা তো আমি দোকানেও দেখতে পারতাম। অন্যের জিনিস তো নয়। পুজোর সব কেনাকাটা শেষ। বাজারে কোথাও ওরকম একটা জামাও দেখতে পাইনি। সব আশা যখন ছেড়ে দিয়েছি যখন, তখনই আমার মামা এলেন আমার জন্য একটা জামা নিয়ে। প্যাকেটটা খুলতেই দেখি আমি যা চাইছিলাম! আমার দৃঢ় বিশ্বাস মনের একান্ত আশা পূরণ হয়।

দিশা ধর
অষ্টম শ্রেণি, হাবড়া কামিনীকুমার গার্লস হাই স্কুল।

আনন্দমেলা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র নিয়মাবলির (১৯৫৬)৮-ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল।

১। প্রকাশস্থান: ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১
২। প্রকাশকাল: পাক্ষিক
৩। প্রকাশক ও মুদ্রক: প্রদীপ্ত বিশ্বাস, ভারতীয় নাগরিক,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১
৪। সম্পাদক: পৌলোমী সেনগুপ্ত, ভারতীয় নাগরিক,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১
৫। যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং যাঁরা মোট মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা, তাঁদের নাম ও ঠিকানা:
(ক) মালিক: এবিপি (প্রা) লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১
(খ) মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক শেয়ার গ্রহীতা: এ সরকার, এ সরকার, এস সরকার, এ সরকার এবং এবিপি হোল্ডিংস (প্রা) লিমিটেড
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১

আমি প্রদীপ্ত বিশ্বাস এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১ মার্চ ২০১৬

প্রদীপ্ত বিশ্বাস
প্রকাশক

ফারাক পাও

দু'টি ছবিতে অন্তত আটটি অমিল রয়েছে। প্রথমে নিজেরা খুঁজে বের করো। তারপর আগামী সংখ্যায় দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিও।

ছবি: প্রীতম দাশ

উত্তর : ২০ মার্চ সংখ্যায়

গত সংখ্যার উত্তর

১) হাতির শুঁড় ছোট।
২) সামনের ব্যাগটা ছোট।
৩) বাঁ দিকের পাহাড়ের চূড়াটা বড়।
৪) ডান দিকের গাছের একটা ডাল যুক্ত হয়েছে।
৫) পিছনের ব্যাগটির হাতল নেই।
৬) মাহুতের হাতের লাঠিটি ছোট।
৭) হাতির হাওদার সামনের রেলিংটা বড়।
৮) ডান দিকের গাছের উপরের দিকের পাতাটা ছোট।

সুদোকু

৭			৮		৬			২
	৪	৯				৬	৫	
				২				
৬		৮	৭		২	৯		৪
				৩				
৪		৩	৫		৯	২		৬
				৫				
	৮	২				৪	৬	
৫			৪		১			৩

এখানে ৯টি ঘরের একটি বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কিছু সংখ্যা বসানো আছে। ফাঁকা ঘরগুলোয় তোমাদের বাকি সংখ্যা এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে পাশাপাশি এবং উপর-নীচে কোনও লাইনে, এমনকী, ছোট-ছোট বর্গক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা যেন দু'বার না বসে!

৪	৯	৩	২	৫	৭	৮	১	৬
৬	৮	২	৩	৯	১	৭	৪	৫
১	৫	৭	৬	৮	৪	৯	৩	২
৮	৪	৫	১	২	৩	৬	৯	৭
৩	৭	৬	৮	৪	৯	৫	২	১
৯	২	১	৫	৭	৬	৪	৮	৩
২	৩	৯	৪	৬	৫	১	৭	৮
৫	১	৪	৭	৩	৮	২	৬	৯
৭	৬	৮	৯	১	২	৩	৫	৪

সুদোকুর সমাধান করে ফোটো তুলে পাঠিয়ে দাও এই ইমেল আইডিতে, anandamelamagazine@gmail.com। সঙ্গে লিখবে স্কুল আর ক্লাস।

এখানে ছ'টি প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে এই সংখ্যারই লেখার মধ্যে। বাকি ছ'টি তোমাদের সাধারণজ্ঞানের পরীক্ষা।

1 সত্যজিৎ রায় একমাত্র ভারতীয় পরিচালক যিনি সারা জীবনের কাজের জন্য 'অস্কার' পেয়েছেন। কত সালে তিনি এই পুরস্কার পান?

2 তামিলনাড়ুর ভি জয়রমন এক টানা হাততালি দিয়ে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন। যেহেতু তিনি ভারতীয়, তাঁকে নিয়ে খুব হইচই হয়েছিল। তিনি কত ঘণ্টা টানা হাততালি দিয়েছিলেন?

3 ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপ নিয়ে চারিদিকে এত যে হইচই হতে দেখো, বলতে পারবে তার শুরুটা হয়েছিল কোন দেশে এবং কবে থেকে? কোন-কোন দেশ অংশ নিয়েছিল প্রথম সেই বিশ্বকাপে?

4 রবীন্দ্রনাথের ধারা অনুসরণ করে কাজী নজরুল ইসলামও বিদেশি সুর সংযোজন করে নিজের গানকে বৈচিত্রময় করেছেন। যেমন, কিউবান সুরে 'দূর দ্বীপবাসিনী', মিশরীয় সুরে 'মোমের পুতুল'। কোন বিদেশি সুরে বসিয়েছেন 'শুকনো পাতার নূপুর পায়ে নাচিছে ঘূর্ণী বায়ে' গানটিকে?

5 বিরাট রাজ্যে অজ্ঞাতবাসের সময় পাণ্ডবরা কে কী ছদ্মনাম নিয়েছিলেন মনে আছে?

6 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?/ দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে, কে পরিবে পায়'? তোমাদের সকলেরই জানা এই কবিতাটি কার লেখা?

7 বাড়িতে বসে অনেক কিছুই তো তৈরি করতে শিখেছ তোমরা। কোন-কোন উপকরণ হাতের কাছে থাকলে তুমি দুটো রনপা তৈরি করতে পারবে?

8 'কোনওক্রমে বেঁচে আছি এই পর্যন্ত। অনেককিছু থেকেই দূরে থাকতে বলেছে...' কে বলেছে? কাকে বলেছে?

9 বিশ্বের দ্রুততম টেস্ট সেঞ্চুরি কে করেছেন? কোন মাঠে ও কত বলে?

10 বিয়েবাড়িতে সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহকারে যে আসর বসে তাকে কী বলে?

11 আর-পাঁচটা সাধারণ মানুষের থেকে তিনি অনেকটা বেশিই সমর্থ, শক্তিমান। দৈহিক বলে তিনি সুপারম্যান না হতে পারেন কিন্তু তাঁর ট্রেডমার্ক অস্ত্রটির নাম মনের জোর। কে তিনি?

12 ডিসেম্বর মাসের এক রবিবার পিসি আর হর্ষদাদার সঙ্গে কে ইকো পার্কে বেড়াতে গিয়েছিল?

সুদেষ্ণা বসু

৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

১. 'যমুনা' ও 'রূপ ও রঙ্গ'।
২. দক্ষিণ আমেরিকার আমাজ়ন নদীর ধারের জঙ্গলের কয়েকটি বিশেষ অংশে।
৩. স্টিভ আরউইন।
৪. রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৫. ব্রাজ়িল। ৪-১ গোলে ইতালিকে হারিয়েছিল।
৬. পি বি শেলি। ইতালিতে।
৭. শুভম রায়। 'আমার দুনিয়া'য়।
৮. 'দুঃখ ডট কম' গল্পের সাধুচরণ সমাদ্দার।
৯. সিয়াটেল যাওয়ার পথে অবনী বলেছিলেন মেয়ে গুড়িয়াকে।
১০. সান্তাক্রুজ়।
১১. কামানগাড়ি। 'ওসমান' গল্পে।
১২. একটা খেলনা টেবিল ঘড়ি।

সঠিক উত্তরদাতা

অনুষ্কা দত্ত
সপ্তম শ্রেণি, বি ডি এম ইন্টারন্যাশনাল, গড়িয়া।

দীপায়ন দাস
অষ্টম শ্রেণি, সি এম এস হাইস্কুল, বর্ধমান।

উত্তর পাঠাও ২৮ মার্চের মধ্যে। আমাদের ঠিকানা 'আনন্দমেলা আমাদের কুইজ়' বিভাগ।
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১